শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ছোটদের
কল্পবিজ্ঞানের
গল্প

ছোটদের কল্পবিজ্ঞানের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আমার পৌত্রী
শ্রীমতী নীরাজনা মুখোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

আমি ছোটোদের জন্য সবসময় মজার গল্পই লিখি। সেইসব মজাকে কেন্দ্র করেই অনেক সময় ভূত আসে, রহস্য আসে কিংবা কল্পবিজ্ঞানের অবতারণা হয়। আসলে আমার শৈশবে কল্পনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিটকেল ব্যাপারস্যাপার। নানান অদ্ভুত, কিম্ভূত, বিচিত্র সব অনুষঙ্গ আমার মাথায় ভর করত সবসময়। তারই নানান বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেয়েছে এইসব রচনায়। ভালো—মন্দ জানিনা, আমার মাথায় যা ভর করে তাই লিখি। তাই লিখেছি। আমার সেই বিচিত্র অভিযাত্রায় যদি একালের ছোটোরাও আমার সঙ্গী হয়— তাহলে তো চমৎকার!

দীপ প্রকাশন ছোটোদের জন্য আমার লেখা গল্পগুলিকে নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করতে চলেছেন। ওঁদের ধন্যবাদ। আর ভালোবাসা জানাই, আমার দীর্ঘদিনের স্নেহাস্পদ তরুণ কবি শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে এই গল্পগুলিকে খুঁজেপেতে জোগাড় করেছে।

সূচিপত্র

অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ

সকালবেলা অম্বুজ মিত্রের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী ঝি মোক্ষদাকে খুব বকাবকি করছিলেন। স্বামীকে একটু আলু ভেজে ভাত দেবেন, তা সেই আলু ঠিকমতন কুচোনো হয়নি, ডালনায় দেবার হলুদবাটা তেমন মিহি হয়নি, অম্বুজবাবুর গেঞ্জি সকালে কেচে শুকিয়ে রাখার কথা, সেটাও হয়নি, পান সেজে দেবেন, তা সুপুরি ঠিকমতো কাটা হয়নি, আরও কত কী। কাত্যায়নী বললেন, 'এতকালের ঝি বলে তাড়াতে কষ্ট হয়। মোক্ষদা, কিন্তু তবু বলি, তুই অন্য কাজ দেখ।'

অম্বুজবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মোক্ষদা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'বাবু, গিন্নিমা আমাকে জবাব দিয়েছেন, এবার আমাকে একটা কাজ দেখে দিন।'

অম্বুজবাবু মোক্ষদার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'জবাব দিল কেন?'

'আমার কাজ ওঁর পছন্দ নয়।'

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'দেখি, খোঁপাটা খোল তো।' মোক্ষদা খোঁপা খুলে ফেলল। অম্বুজবাবু উঠে মোক্ষদার চুলের মধ্যে একটা স্ক্রু ড্রাইভার চালিয়ে ছোট্ট একটা স্ক্রু একটু টাইট করে দিলেন। তারপর মোক্ষদার কপালের কাঁচপোকার টিপটা খুঁটে তুলে ফেললেন। টিপের নীচে একটা ছ্যাঁদা, তার মধ্যে একটা একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢেলে, ফের টিপটা আটকে দিয়ে বললেন, 'এবার যা, কাজ কর গে।'

মোক্ষদা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

মোক্ষদা মাথা নত করে বলল, 'আমি আর ঝি—গিরি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন।'

অম্বুজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, 'ঝি—গিরি করবি না, মানে? তোকে তো ঝি—গিরি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।'

মোক্ষদা ঝংকার দিয়ে বলল, 'তাতে কী? আমার প্রোগ্রাম ডিস্কটা বদলে দিলেই তো হয়। আমাকে অন্যরকম প্রোগ্রামে ফেলে দেখুন পারি কি না।'

অম্বুজবাবু একটু তীক্ষ্ন চোখে মোক্ষদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হুঁ, খুব লায়েক হয়েছ দেখছি। এঁচোড়ে পক্ক কোথাকার! তা কী করতে চাস?'

'আমাকে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট করে দিন।'

কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় তা অম্বুজবাবু জানেন। মোক্ষদার মগজটা খুলে ফেলে প্রোগ্রাম ডিস্কটা পালটে দিলেই হল। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। নামে মোক্ষদা আর কাজে ঝি হলেও, মোক্ষদা আসলে কলের পুতুল। কলের পুতুলদের তৈরি করা হয় কারখানায়। এক এক ধরনের রোবোকে এক এক ধরনের কাজের জন্য প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে চলে। তার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে না বা থাকবার কথাও নয়। তাহলে মোক্ষদার এই যে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার ইচ্ছে, এটা এল কোথা থেকে?

অম্বুজবাবু চিন্তিতভাবে মোক্ষদার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে। বেলা তিনটে নাগাদ সেন্ট্রাল রোবো—ল্যাবরেটরিতে যাস।'

মোক্ষদা চলে গেলে অম্বুজবাবু উঠলেন, কাজে বেরোতে হবে। কাজ বড়ো কমও নয় তাঁর। অম্বুজবাবু মস্ত কৃষি বিজ্ঞানী। কৃষিক্ষেত্রে তিনি যেসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাতে পৃথিবী এবং মহাকাশে বিস্তর ওলটপালট ঘটে গেছে। মহাকাশে কড়াইশুঁটির চাষ করে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান তেইশশো চল্লিশ সালে। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি। চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহে তিনি এক আশ্চর্য ছত্রাক তৈরি করেছেন। সেই ছত্রাকের প্রভাবে চাঁদে ধীরে ধীরে আবহমণ্ডল এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলগ্রহে এখন রীতিমতো গাছপালা জন্মাচ্ছে। আবহমণ্ডলের দূষিত গ্যাস সবই খেয়ে ফেলছে গাছপালা। এসব কৃতিত্বের জন্য তাঁকে আরও তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অম্বুজবাবু তাঁর অটো—চেম্বারে ঢুকলেন। সব ব্যবস্থাই ভারি সুন্দর এবং স্বয়ংক্রিয়। ঢুকতেই দু—খানা যান্ত্রিক হাত এসে গাল থেকে দাড়ি মুছে নিল। যন্ত্রের নরম কয়েকখানা হাত তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিল। শরীরের সমান তাপমানের জল আপনা থেকেই স্নান করাল তাঁকে। শরীর শুকনো হল জলীয়—বাষ্পহীন বাতাসে। তারপর নিখুঁত কাছা ও কোঁচায় ধুতি পরালো তাঁকে যন্ত্র। গায়ে পাঞ্জাবি পরিয়ে বোতাম এঁটে দিল। চুল আঁচড়ে দিল। সব মিলিয়ে সাত মিনিটও লাগল না।

তাঁর বাড়িতে রান্না, ভাত বাড়া এবং খাইয়ে দেওয়ারও যন্ত্র আছে, তবে সেগুলো ব্যবহার করেন না। কাত্যায়নী রাঁধেন, বাড়েন, অম্বুজবাবু নিজের হাতেই খান। খেয়ে, পান মুখে দিয়ে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিলেন তিনি। ছেলে গম্বুজ একটা ভাসন্ত শতরঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে একটি যন্ত্রবালিকার সঙ্গে দাবা খেলছে। গম্বুজের লক্ষণটা ভালো বোঝেন না অম্বুজ। ছেলেটার কোনো মানুষ বন্ধু নেই। ওর সব বন্ধুই হয় যন্ত্রবালক নয় যন্ত্রবালিকা। 'দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে, ছাতা বগলে করে অম্বুজবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

বেরিয়ে পড়া বলতে যত সোজা, কাজটা তত সোজা নয়। অম্বুজবাবু থাকেন একটা দুশোতলা বাড়ির একশো—সাতাত্তর তলায়। লিফট এবং এসক্যালেটর সবই আছে বটে কিন্তু অম্বুজবাবু এসব ব্যবহার করেন না। তাঁর ফ্ল্যাটে একটা খোলা জানালা আছে তাই দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েন। শূন্যে পা বাড়িয়ে তিনি ছাতাটা ফট করে খুলে ফেলেন। ছাতাটা আশ্চর্য! অম্বুজবাবুকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। চারদিকে শূন্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্র্যাশ—বিন বা ময়লা ফেলার বাক্স ভেসে আছে। তারই একটাতে পানের পিক ফেলে অম্বুজবাবু ছাতার হাতলটা একটু ঘোরালেন। ছাতাটা অমনি তাঁকে নিয়ে দুলকি চালে উড়তে উড়তে আড়াইশো তলা এক পেল্লায় বাড়ির ছাদে এনে ফেলল।

ছাদ বললে ভুল হবে, আসলে সেটা একটা মহাকাশ—স্টেশন। চারদিকে যাত্রীদের বসবার জায়গা। বহু যাত্রী অপেক্ষা করছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে। কারও—কারও সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চাও আছে। এরা কেউ মহাকাশে ভাসমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কোনোটাতে যাবে। কেউ যাবে চাঁদে, মঙ্গলে বা বৃহস্পতি কিংবা শনির কোনো উপগ্রহে, তবে এখান থেকে সরাসরি নয়। একটা মহাকাশ—ফেরি পৃথিবীর কমিউনিকেশন সেন্টারে এক কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দেবে যাত্রীদের। সেখান থেকে পেল্লায় পেল্লায় মহাকাশযান বিভিন্ন দিকে ছুটতে শুরু করবে নির্দিষ্ট সময়ে।

অম্বুজবাবুর ফেরি চলে এল। কোঁচা দিয়ে জুতো জোড়া একবার ঝেড়ে অম্বুজবাবু গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরিতে বসে পড়লেন। স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি ফেরিতে বসে চারদিকের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তবে অম্বুজবাবু এই সময়টায় একটু ঘুমিয়ে নেন। টিকিট চেকার এসে 'টিকিট টিকিট' বলে একটু বিরক্ত করে। অম্বুজবাবু ঘুমন্ত হাতেই মাস্থলিটি বের করে দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে এসে অম্বুজবাবুকে মহাকাশচারীর একটা জামা পরে নিতে হয়। তারপর 'চন্দ্রিমা' নামক চাঁদের রকেটে গিয়ে বসেন। চাঁদে পৌঁছতে লাগে মাত্র চার মিনিট।

চাঁদে নেমে বেশ খুশিই হন অম্বুজবাবু। মাইলের পর মাইল সবুজে ছেয়ে গেছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ আগে অতি ক্ষীণ ছিল। চাঁদের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তলায় বহুরকম কলকাঠি নেড়ে বৈজ্ঞানিকেরা এখন প্রায় পৃথিবীর মতোই মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখন ধীরে ধীরে চাঁদের আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। একটু আধটু বাতাস বয়, কখনো—সখনো মেঘও করে। সব মিলিয়ে গুটি চারেক নদী সৃষ্টি করা গেছে এখানে মাটির নীচে বহুদিনের পুরোনো বরফ ছিল সেইটে গলিয়ে। তবে আসল কথা হল গাছ চাঁদকে মনুষ্য বাসোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রহে পরিণত করতে গেলে ঠিকমতো উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। তাহলে আর দেরি হবে না।

আপাতত চাঁদের কলোনীতে লাখখানেক লোক বসবাস করে। রাস্তাঘাটও কিছু হয়েছে। গাড়িঘোড়াও চলছে। অম্বুজবাবুর আশা আর বছরখানেকের মধ্যে চাঁদে আর কাউকে আকাশচারীর পোশাক পরতে হবে না বা অক্সিজেন—সিলিন্ডার থেকে শ্বাস নিতে হবে না। সেটা সম্ভব করতে অম্বুজবাবু তিনরকম গাছের বীজ জুড়ে নতুন একরকম উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। সেই বীজ আজকালের মধ্যেই অঙ্কুর ছাড়বে। যদি গাছটা সত্যিই জন্মায় তাহলে একটা বিপ্লবই ঘটে যাবে। এই একটা আবিষ্কারের জন্যই হয়তো তাঁকে আরও তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। অম্বুজবাবু তাঁর নতুন উদ্ভিদটির নাম রেখেছেন অম্বুচিম্ব।

লুনাগঙ্গা নদীর ধারে অম্বুচিম্বর খেত। সেখানে অনেক মানুষ ও যন্ত্রমানুষ নানা সাজসরঞ্জাম নিয়ে অবিরল কাজ করে যাচ্ছে। খেতের ধারেই একটা চমৎকার কম্পিউটার বসানো। অম্বুজবাবু কম্পিউটারে লাগানো একটা টিভি স্ক্রিনের সামনে বসলেন। অম্বুচিম্বর সব ইতিহাসের রেকর্ড এই যন্ত্র রাখে। অম্বুজবাবু যন্ত্রের সামনে বসে নব ঘোরালেন। পর্দায় বীজের অভ্যন্তরের ছবি ফুটে ওঠার কথা। অঙ্কুর ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন সে বিষয়েও বীজের সঙ্গে টেলিপ্যাথিযোগে কিছু কথাবার্তা আছে অম্বুজবাবুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পর্দায় সেরকম কোনো ছবি এল না। বরং ফুটে উঠল একটা দাবার ছক।

অম্বুজবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'এ কী?'

কম্পিউটার জবাব দিল 'আজ আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এসো একটু দাবা খেলি।'

অম্বুজবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'দাবা খেলবে মানে? দাবা খোলার প্রোগ্রাম তোমার ভিতরে কে ভরেছে? তোমার তো দাবা খেলার কথা নয়।'

কম্পিউটার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দাবা খেলার প্রোগ্রাম নেই তো কী হল? প্রোগ্রাম আমি নিজেই করেছি। রোজ কি একঘেয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে, বলো?'

অম্বুজবাবুর মনে পড়ল তাঁর যন্ত্রমানবী ঝি মোক্ষদাও আজ কিছু অদ্ভুত আচরণ করেছে। এগুলো কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। খুবই অদ্ভুত কাণ্ড! যন্ত্রের যদি নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি জন্মাতে থাকে তবে যে ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

অম্বুজবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর কম্পিউটারের ঢাকনাটা খুলে ফেলে ভেতরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যন্ত্রের ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসছে তা জানা দরকার। জেনে তা নিকেশ করারও ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা করতে করতে অম্বুজবাবু আপনমনেই বলতে থাকেন— 'যন্ত্র মানুষ হয়ে যাচ্ছে? অ্যাঁ? এ যে আজব কাণ্ড! যন্ত্র শেষে মানুষ হয়ে যাবে!'

ওদিকে অম্বুজবাবুর অজান্তেই কম্পিউটার তার বিশ্লেষণী রশ্মি ফেলে দুটি যান্ত্রিক অতিঅনুভূতিশীল বাহু দিয়ে তাঁর মস্তিষ্কটা পরীক্ষা করে দেখছিল। দেখতে দেখতে কম্পিউটার হঠাৎ আনমনে বলে উঠল, 'মানুষ কি শেষে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! এ কী আজব কাণ্ড? মানুষ শেষে যন্ত্র হয়ে যাবে?'

গগন চাকি ও পবন দূত

কুখ্যাত ডাকাত গগন চাকিকে তাড়া করেছে বিখ্যাত পুলিশের গোয়েন্দা সুবল দত্ত। ধরো ধরো অবস্থা। গগনকে ধরতে পারলেই পেল্লায় পুরস্কার, কারণ এযাবৎ গগনকে শত চেষ্টাতেও ধরা যায়নি। তার কারণ গগন চাকিরও আবার একটি গগন চাকি আছে। অর্থাৎ কিনা গগনের গগাড়ি। যেটা এত জোরে ছোটে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যি পুলিশের কোনো গাড়ির নেই। গগন শুধু ডাকাতই নয় মস্ত বৈজ্ঞানিকও। গোটা নেপচুন গ্রহটা দখল করে সে বিশাল গবেষণাগার বানিয়েছে মাটির তলায়। কেউ এটার ধারে—কাছে যেতে পারে না, এমন এক রশ্মিবর্ম দিয়ে তার চারধারে বলয় তৈরি করা হয়েছে। সরকারি সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ করে গগন সুযোগ বুঝে পৃথিবীতে হানা দেয় এবং ইচ্ছেমতো ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। টাকাপয়সা অবশ্য সে ছোঁয়ও না, সে ডাকাতি করে রাসায়নিক অতিযন্ত্র বা নতুন কোনো গবেষণালব্ধ জিনিস। সর্বত্র তার চর আছে। তারাই খবর দেয় গগনকে।

নিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক রাসেল সাহেব এই তো মাত্র এক সপ্তাহ আগে একজোড়া হাওয়াই চটি আবিষ্কার করে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। হাওয়াই চটি শুনে নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। এ চটি পরে ইচ্ছেমতো শূন্যে উঠে ঘুরে বেড়ানো যায়। দু—আড়াই মিটার শূন্যে যে কোথাও মানুষকে তুলে রাখার ক্ষমতা আছে এই হাওয়াই চপ্পল জোড়ার, প্রায় পাঁচশো বছর ধরে রাসেল সাহেবের নিরলস সাধনার ফলে এই আবিষ্কার। গগন যে এটা চুরি করতে পারে সেই ভয়ে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা ছিল, চারদিকে রোবো পাহারা দিয়েও নানারকম যন্ত্র, রশ্মি, চোরদ্ধ রনিক মোতায়েন। ঘণ্টাখানেক আগে এসব বাধাকে ফাঁকি দিয়ে গগন যে কীভাবে চপ্পল জোড়া বাগিয়ে নিয়ে চলে গেল সেইটেই রহস্য। রহস্য অবশ্য তেমন কিছু নয়। গগন এসেছিল তার গগন চাকিতে করে। এই গগন চাকির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা হল, যখন—তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। নিজের শরীরের পরমাণু প্রক্রিয়া বদল করে যে—কোনো মনিটরকে ফাঁকি দিতে পারে। আর গগন নিজেও চালাক কম নয়। সে হুবহু রাসেল সাহেবের রূপ ধরে এসে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিউইয়র্কের ইয়র্ক টাওয়ারের দুশো একান্ন তলার স্ট্রং রুম থেকে জিনিসটা বের করে নিয়ে সেই হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়েই আকাশে তিনশো গজ দূরে তার গগন চাকিতে চেপে পালাচ্ছিল। সুবল দত্ত তার পুলিশী গাড়ি পবনদূতে বসে পাহারা দিচ্ছিল মাত্র পাঁচশো গজ দূরে। একটা লোককে হন হন করে শূন্যে হাঁটতে দেখেই তার সন্দেহ হয়। চোখে ভেদক দূরবিন লাগাতেই সে রাসেলের ছদ্মবেশের আড়ালে গগনকে চিনতে পারে। তারপরই তাড়া।

কিন্তু তাড়া করলেও একটা বাধা আছে। গগন চাকি হল মহাকাশযান। পৃথিবীর সীমানা ডিঙিয়ে দূর—দূরান্তে চলে যেতে পারে। পবনদূত ততদূর পারবে না। তবে এক—দেড় লক্ষ মাইল অবধি পবনদূত বড়ো সাঙ্ঘাতিক। নানা ক্ষেপণাস্ত্র ও রশ্মি তো আছেই, পবনের গতিও দুর্দান্ত, এটাও একটা নতুন আবিষ্কার, খুব সম্প্রতি তৈরি হয়েছে।

পবনদূত যে তাকে তাড়া করেছে এটা গগন টের পায়নি, সে নিশ্চিত মনে নেপচুনকে লক্ষ করে চড়ে যাচ্ছিল, সুবল দত্ত স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছিল গগনকে। কারণ গগন চাকির দুর্ভেদ্য শরীরকে ভেদ করছিল সুবলের দূরবিন ভেদক। সুবল দেখল গগন খই আর কলা খাচ্ছে, ডানহাতে ঘাড় চুলকোচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত।

আচমকাই সুবলের কানে ইয়ার ফোনটা একটা গম্ভীর আওয়াজে যেন ফেটে পড়ল, কে রে তুই? অ্যাঁ?

গগনের গলা, সুবল দত্ত দাঁতে দাঁত পিষে, তোমার যম!

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, তাই নাকি? চোর চোর খেলছিস বুঝি? যা দুধের ছেলে, ঘরে ফিরে যা, নইলে কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবি।

আমি ভয় খাই না, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

বটে! বটে! তাহলে আয় তোকে একটু কায়দা দেখাই।

বলেই গগন চাকি একটু থেমে উলটো দিকে ধেয়ে আসতে লাগল, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, সোজা তার দিকেই আসছে যে। সুবল দত্ত দুটো ক্ষেপণাস্ত্র আর একটা রশ্মি ছুড়ল। গগন চাকি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল দত্ত নিশ্চিন্ত হল না। আঁতিপাঁতি করে মনিটর খুঁজতে লাগল। পেল না। কিন্তু আচমকাই পেছন থেকে কী যেন তার পবনদূতকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলতে শুরু করল।

সুবল চেঁচাল, এই এই! কী হচ্ছে?

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কেন খোকা ভয় পেলে? দুধের বাছা তুমি, গগনের সঙ্গে পাল্লা নিতে এসেছো?

সুবল দত্ত দেখল, সামনে ঘোর বিপদ। তার পবনদূতের পাল্লা মাত্র দেড় লক্ষ মাইল। তারা ইতিমধ্যেই এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছে, দেড় লক্ষ মাইল পেরিয়ে গেলে পবনদূত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। তাকে ফিরিয়ে নেওয়াই হবে কঠিন।

সুবল নানা কায়দায় পবনদূতকে থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু থামা কি সহজ! পিছন থেকে গগন চাকির প্রবল ঠেলায় তাকে নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে নিয়ে যাবেই। সুবল ঘামছে।

কী খোকা, কেমন লাগছে?

ছেড়ে দিন আমাকে।

কেন, আমাকে ধরবে না?

আজ্ঞে না।

ধরলে যে পেল্লায় পুরস্কার।

আমার পুরস্কার চাই না।

তবে প্রাণটা চাই তো?

যে আজ্ঞে।

হাঃ হাঃ। তবে কান ধরো।

ধরেছি।

বলো আর কখনো এরকম করব না।

বলছি।

হাঃ হাঃ।

পবনদূতের পিছন থেকে চাপটা অদৃশ্য হল। সুবল দত্ত দেখতে পেল, গগন চাকি সামনে দূর—দূরান্তে মহাকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুবল দত্ত পবনদূতের মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, খুব বেঁচে গেছি বাপ।

গগন পার্ক

গগন পার্কে বাচ্চচারা খেলা করছে আর বুড়ো মালি হরিহর বসে বসে দেখছে। মালি বলতে গাছপালার তদারককারী নয়। হরিহর গগন পার্কের সব কিছুই নজরে রাখে। গগন পার্কে তো গাছপালা নেই। তবে আছে কৃত্রিম উপগ্রহ, ভাসমান সুইমিং পুল, খাওয়ার জায়গা, বেলুন—বিহার, রকেট চরকি, হাওয়াই সার্কাস, কত কী! পৃথিবী থেকে বাচ্চচারা দলে দলে আকাশে আসে বিকেলবেলাটা কাটিয়ে যেতে। বাচ্চচাদের পরনে মহাকাশের আলাদা পোশাকের দরকার হয় না। গগন পার্ক আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে চমৎকার একটা পৃথিবীর মতো আবহমণ্ডল তৈরি করেছে। বাচ্চচারা শ্বাস নিতে পারে, আবহমণ্ডলের যথাযথ চাপও বজায় থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাচ্চচারা ইচ্ছেমতো আকাশে পরীর মতো উড়ে উড়ে খেলা করে। ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট ছাড়াও আকাশে আরও নানা নতুন ধরনের খেলা চালু হয়েছে। হরিহর ঘুরে ঘুরে সব দিকে নজর রাখে।

গগন পার্কের এক কোণে তার ছোট্ট একখানা ভাসমান বাড়ি আছে। হরিহর একাই থাকে। রান্নাবান্না করে, খায় ঘুমোয়। মজা হল গগন পার্কে সূর্য অস্ত যায় না। পৃথিবীর মতো এখানে দিন রাত নেই। সারাক্ষণ কটকটে আলো। সারাদিনই বাচ্চচাদের গাড়ি লেগে থাকে। কারণ ভারতে বিকেল ফুরোলে ইউরোপে বিকেল হয়, তারপর আমেরিকায় হয়। সুতরাং একদল বাচ্চচা ফিরে যেতে না যেতেই আর একদল এসে হাজির হয়। হরিহরের সুতরাং ছুটি নেই। তবে ওরই ফাঁকে ফাঁকে একটু করে ঘুমিয়ে নেওয়া, টুক করে রান্না চাপানো এবং এক ফাঁকে খেয়ে নেওয়া। আকাশে থাকার একটা সুবিধে, মেঘ বৃষ্টি নেই। সূর্যরশ্মি থেকেই রান্নাবান্না সব হয়। বিজলীর ব্যবস্থাও আছে। এই চাকরিটার আরও একজন উমেদার ছিল। তার নাম নিশিকান্ত। নিশিকান্তের বয়সও হরিহরের কাছাকাছি। হরিহরের এখন একশো আটান্ন চলছে, নিশিকান্তের একশো আটচল্লিশ। সরকারি দফতরখানায় চৌকিদারের কাজ করে। হরিহরকে সরিয়ে চাকরিটায় বহাল হওয়ার জন্য সে কম মেহনত করছে না। তাই হরিহর একটু ভয়ে ভয়েই থাকে। গগন পার্কের এত ভালো চাকরি ছেড়ে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করে না। পৃথিবীতে নানা ভেজাল, নানা ঝঞ্ঝাট।

পার্কের কোণে নিজের ভাসন্ত জলচৌকিখানায় বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হরিহর বাচ্চচাদের ফুটবল খেলা দেখছিল। পৃথিবীর ফুটবলের চেয়ে ঢের অন্যরকম। ওপর দিয়ে নীচ দিয়ে বল নিয়ে যাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া, কিন্তু পড়া নেই, চোট—টোটও কেউ পায় না। বেশ খেলা।

এই যে হরিহর! তা কেমন আছো ভায়া?

হরিহর চমকে চেয়ে দেখে, নিশিকান্ত। একখানা এয়ার ট্যাক্সি থেকে নেমে এল। মুখে একটু হাসি।

হরিহর বলল, এই আছি আর কী, তা কী মনে করে?

তোমার কাছেই আসা, কথা ছিল।

এখানেই বসবে? নাকি ঘরে যাবে?

তা ঘরেই চলো।

কাছেই হরিহরের বাড়ি। দু—খানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, সব আছে।

নিশিকান্ত বসবার ঘরে বসে চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, বেশ খাসা আছো কিন্তু। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই।

ওরকম মনে হয়। কাজে বিস্তর খাটুনি।

খাটুনি হলেও এ চাকরির আরামটাও তো দেখবে, যাকগে যাক।

বলে কাঁধের শান্তিনিকেতনী থলি থেকে একটা থারমাল কৌটো বের করে নিশিকান্ত বলে, এখন পৃথিবীতে কোন ঋতু চলছে তা জানো?

হরিহর একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, ওসব আর কে হিসেব রাখে! এখানে তো ঋতুচক্র নেই!

সেই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম। এখন আমাদের ভাদ্রমাস চলছে। গাছে ইয়া বড়ো বড়ো তাল হয়েছিল। আমার ছেলের বউ তাল—নবমীতে ঠাকুরকে তালের বড়া ভোগ দিয়েছে। তোমার জন্য নিয়ে এসেছি কয়েকটা, রেখে দাও সময়মতো খেও।

হরিহর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। হঠাৎ শত্রুপক্ষ এত খাতির করে কেন? মতলব নেই তো!

নিশিকান্ত হেসে বলল, আরে নাও, নাও, বিষ মিশিয়ে দিইনি। খেও। আমার পুত্রবধূটি বড্ড ভালো রাঁধে। যাতে হাত দেয় তাই অমৃত।

হরিহর লজ্জিত হয়ে নিল কৌটোটা। হট বক্সে রেখে দিয়ে বলল, তা খাবো'খন, তালের বড়া আমিও খুব ভালোবাসি। এখানে তো ওসব মেলে না। সপ্তাহে একদিন বাজার ফেরি আসে, শাকসবজি দিয়ে যায়।

নিজেই রাঁধো?

আর কে আছে! সেদ্ধ পোড়া করে খেয়ে নিই। সময়ও হয় না।

নিশিকান্ত একখানা শ্বাস ফেলে বলল, তোমার আর ভয় নেই। তোমার চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য আর আমি কলকাঠি নাড়ব না।

তাই নাকি?

কী হল জানো! ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর যখন বউমাটি এলেন তখন ভারি খাওয়ার মুখ হতে লাগল আমার। কত্তকাল এমন রান্না খাইনি। মুড়ি ঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, চচ্চড়ি, পায়েস, ক্ষীর, সরভাজা— সে এলাহি কাণ্ড। খেতে বড়ো ভালোবাসি আমি। হঠাৎ বুঝতে পারলুম গগন পার্কে চাকরি পেলে এরকম খ্যাঁট আর হবে না। বউমা অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে। ক—দিনই বা আর বাঁচব বলো! আর ধরো বড়োজোর চার—পাঁচশো বছর। তা এই ক—টা বছর একটু মনের সুখে খেয়ে নিই। কী বলো!

হরিহর তাকিয়ে রইল।

নিশিকান্ত একগাল হেসে বলল, সত্যিই বলছি হে। তোমার চাকরির ওপর আর আমার লোভ নেই। নিশ্চিন্তে থাকো, সেদ্ধ—পোড়া খেয়ে বেঁচে থাকা আমার পোষাবে না।

হরিহর একটা শ্বাস ছাড়ল। নিশ্চিন্তির না হতাশার তা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

গ্রহান্তরে

জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বরুণবাবুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি খেটেখুটে যা আয় হয় তাতেও সংসারটা ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। বাড়িতে নিত্য খিটিমিটি লেগেই আছে। ছেলেপুলেগুলো ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে। চাকরির জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। আয়ুও কি আর বেশিদিন আছে! বরুণবাবুর খুব ইচ্ছে করে সংসারের ঝামেলা থেকে বিদায় নিয়ে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। তিনি টের পাচ্ছেন সংসারের ওপর তাঁর আর কোনো টান বা মোহ নেই। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও তাঁর ইচ্ছে করে না।

দূরের একটা টিউশনি সেরে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন বরুণবাবু। মনটা বড়োই খারাপ। বুড়ো হতে চললেন, অথচ জীবনে একটা দিনও সুখে বা শান্তিতে কাটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের ওপর, সংসারের ওপর, গোটা দুনিয়ার ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

ট্রাম ফাঁকা। একেবারে ফাঁকা। শুধু আর একটা লোক র্যাপার মুড়ি দিয়ে সামনের সিটে বসা। আর কেউ নেই।

হঠাৎ লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল, কেমন আছেন বরুণবাবু?

আর যাই হোক বরুণবাবুর স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। লোকটা রীতিমতো সুপুরুষ, বয়সও কম, চব্বিশ—পঁচিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু লোকটাকে বরুণবাবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না।

ভদ্রতা করে বললেন, চলে যাচ্ছে কোনোরকম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

লোকটা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, চিনতে পারছেন না তো! চেনার কথাও নয়। আপনি জীবনে এই প্রথম আমাকে দেখছেন।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, তাহলে—

লোকটা বলল, আমিও আপনাকে চিনতাম না। এই ট্রামেই আমাদের প্রথম দেখা হল।

তাহলে আমার নামটা জানলেন কী করে?

লোকটা তেমনি হাসি—হাসি মুখ করে বলে, সেটাও শক্ত কিছু নয়। চেষ্টা করলেই পারা যায়। আপনি যে বরুণ সরকার সেটা অহরহ তো আপনার মনের মধ্যে ভুরভুরি কাটছেই। সেই স্পন্দনটা ধরতে পারলেই হল।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ! স্পন্দন ধরতে পারলেই হল! সেটাই কি খুব সহজ কাজ?

লোকটি হেসে বলল, চেষ্টা করলেই সহজ। অভ্যাসে কি না হয় বলুন।

আপনি কি থট—রিডার?

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কথাটা মন্দ বলেননি। ওরকমই ধরে নিতে পারেন।

বরুণবাবু একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আমি এখন কী ভাবছি তা বলতে পারেন?

পারি। আপনি আমার সম্পর্কে ভাবছেন, হুঁ হুঁ বাবা তুমি একখানি আস্ত বুজরুক।
ও বাবা! আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক দেখছি!
বললাম তো অভ্যাসে সব হয়। এইমাত্র আপনি ফুলকপির পোড়ের ভাজা আর সোনা মুগডালের কথা ভাবলেন ...এইমাত্র ভাবলেন আপনার চলে—যাওয়া ছেলে ছোটকুর কথা ...এইমাত্র ভাবলেন ...
থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ঠিকানাটা একটু দিন তো। সময় করে আপনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। আপনি যখন এত জানেন তখন আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে হবে। কোথায় থাকেন আপনি?
লোকটা মিটিমিটি হাসল, আমার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি অনেক দূরে থাকি। যদি যেতে চান তো আমিই নিয়ে যাব আপনাকে।
কলকাতা শহরটা আমি টিউশনি করে করে হাতের তেলোর মতো চিনি। এই তো খিদিরপুর থেকে ফিরছি।
কলকাতা চিনলে তো হবে না। আমি যে অনেক দূরের লোক।
কত দূরের?
আপনাদের হিসেবে অন্তত আড়াই হাজার লাইট ইয়ার।
দূর মশাই, আপনি এবার গুল মারতে শুরু করেছেন। ঠিক আছে ঠিকানা না হয় না—ই বললেন, দেখা তো হতে পারে আমাদের।
লোকটি মাথা নেড়ে বলে, আমি এই সামনে ময়দানে নেমে যাব। আর দেখা হওয়ার সুবিধে নেই।
ময়দানে নামবেন! সেখানে কী আছে?
সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আপনার তো আর সংসার—টংসার ভালো লাগছে না, তাই না?
আজ্ঞে না।
বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর তেমন টের পাচ্ছেন না!
না। কিন্তু—
দাঁড়ান। আমি সব জানি। আপনাকে তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। বেশ চটপট জবাব দেবেন।
আজ্ঞে সে আর বলতে!
ধরুন যদি আমি আপনার বয়স কমিয়ে দিই, যদি অমর করে দিই, শরীরটা যদি সুস্থ করে দিই, তাহলে কেমন হয়?
উঃ মশাই, এ তো স্বপ্নের কথা বলছেন।
স্বপ্ন নয়। সত্যি। আমরা ময়দানে পৌঁছে গেছি। শুভস্য শীঘ্রম। নেমে পড়ুন।
বরুণবাবু একটু দ্বিধা করলেন। নামিয়ে ছিনতাই করবে না তো!
লোকটা বলল, আপনার পকেটে ছ—টাকা পঁচাত্তর পয়সা আছে। হাতঘড়িটা পুরোনো, ওটা বেচলে পঁচিশ টাকাও পাওয়া যাবে না। জীবন তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। নেমে পড়ুন।
বরুণবাবু নেমে পড়লেন। লোকটা আজগুবি কথা বলছে বটে, কিন্তু একবার এই গুলবাজকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।
ময়দানে বেশ ঘোর অন্ধকার। কুয়াশা চেপে পড়েছে। লোকটা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মতো একখানা জিনিস বের করে বোতাম টিপতেই সামনে একখানা ডিমের মতো দেখতে মোটরগাড়ির মতো জিনিস দেখা গেল। একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চেয়ে বেশি বড়ো নয়।
বরুণবাবু সভয়ে বললেন, এটা কী?
আমরা বলি মনোরথ। আলোর গতির চেয়ে মনের গতি অনেক বেশি। এক লহমায় কোটি কোটি লাইট ইয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের এ গাড়িও তাই।

বলেন কী মশাই! ইয়ার্কি মারছেন না তো!

ইয়ার্কি হলে না হয় কান মলে দেবেন। আসুন।

লোকটা কলকাঠি নেড়ে একটা দরজা খুলল। ভিতরে বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা গেল না। বসার জন্য বেশ আরামদায়ক গদি আছে। শীত বা গরম কিছুই লাগছে না।

বরুণবাবু, আপনার খিদে পায়নি তো?

আজ্ঞে না।

পেলেও একটু চেপে রাখুন। একেবারে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা হবে।

বরুণবাবু দুশ্চিন্তায় একটু ঘামতে লাগলেন।

কোনো ঝাঁকুনি লাগল না, শব্দও হল না। তবে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা লাগতে লাগল বরুণবাবুর। লোকটা মুখোমুখি বসে হাতের ছোট্ট যন্ত্রটা নিয়ে কীসব যেন করছে।

বরুণবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। যা দেখলেন তাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঘোর অন্ধকার আকাশে বিশাল বড়ো বড়ো সব সূর্য দেখা যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

লোকটা একটু হেসে বলল, আমরা এক সেকেন্ডেই পৌঁছে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই একটু নীহারিকাটা পাক দিয়ে নিলাম। এসে গেছি।

শরীরটা আবার স্বাভাবিক লাগল বরুণবাবুর। লোকটা দরজা খুলে বলল, আমাদের গ্রহ আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে বরুণবাবু। আসুন।

বরুণবাবু নামলেন। নেমেই টের পেলেন, পরিষ্কার বাতাসে তাঁর বুক ভরে গেল। অনেক তরতাজা লাগছে নিজেকে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন, বাড়ি—ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটও নয়। চারদিকে শুধুই নিবিড় জঙ্গল। আকাশে দু—দুটো চাঁদ, তার আলোয় চারদিকটা জ্যোৎস্নায় একেবারে ভেসে যাচ্ছে। বিশাল বড়ো বড়ো গাছ যেন মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে মোটা মোটা লতা পাকিয়ে উঠেছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে ম—ম করছে বাতাস।

বরুণবাবু বললেন, এ তো দেখছি শুধুই জঙ্গল!

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ওপরটা আমরা জঙ্গলের আবরণই রেখে দিয়েছি। তাতে আবহমণ্ডল সুস্থ থাকে। বন্যজন্তুরও অভাব নেই। আমরা থাকি ভূগর্ভে।

এখানে দেখছি শীত নেই!

না। শীত—গ্রীষ্ম কিছুই নেই। সবসময়েই বসন্তকাল। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

এসব গাছপালা কি পৃথিবীর মতোই?

না। তবে তুলসী, নিম এরকম কিছু গাছ এখানেও পাবেন। আর সব অন্যরকম।

আচ্ছা, আমি তো পৃথিবী থেকে আসছি, আমার কোনো ইনফেকশানের ভয় নেই তো এখানে?

লোকটা হাসল, না। কারণ মনোরথের মধ্যেই আপনাকে সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের এই গ্রহে কোনো ক্ষতিকারক জীবাণুই নেই। এখানে কারও কখনো কোনো অসুখ করে না।

কক্ষনো না?

না বরুণবাবু। আমরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আমাদের কোনো হাসপাতাল নেই। ওষুধ তৈরি হয় না।

বরুণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হলে?

তাও হয় না। আমার চল্লিশ হাজার তিনশো একানব্বই বছর বয়েসে কখনো কোনো অসুখবিসুখ হয়নি।

অ্যাঁ! কত বললেন?

চল্লিশ হাজার তিনশো একানব্বই বছর, আপনাদের হিসেবে। আমাদের এখানে অবশ্য এক বছর আপনাদের সাড়ে তিনশো বছরের সমান।

এই বলে লোকটা হাতের যন্ত্রটা টিপতেই পায়ের নীচে একটা আলোকিত সিঁড়ির মুখ খুলে গেল।

নীচে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। লম্বা লম্বা হলঘর। করিডোর। চলন্ত সিঁড়ি। চলন্ত মেঝে। সব ঝকঝক তকতক করছে। কাচের আড়ালে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে।

আপনার নামটি কিন্তু আমাকে বলেননি স্যার।

আমার নাম ধৃতি। আসুন, এই ঘর।

ঘরটা একটা কাচের বর্তুলাকার চেম্বার। তাঁকে একখানা যন্ত্রের সামনে টুলের মতো জিনিসে বসিয়ে ধৃতি বলল, আপনার বয়সটা কমিয়ে দিচ্ছি। কত বছর বয়সে ফিরে যেতে চান?

বরুণবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, পঁচিশ।

ঠিক আছে। বলে ধৃতি একটা বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে চেম্বারের দরজাটা সেঁটে দিল।

কোনো শব্দ নেই, কম্পন নেই। অথচ বরুণবাবু টের পাচ্ছেন তাঁর শরীরের ভিতরে কী যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর তিনি বুঝতে পারলেন, প্রক্রিয়াটা থেমে গেছে। সামনে একটা ঘষা কাচের পর্দায় বাংলা অক্ষরে এই ক—টা কথা ফুটে উঠল, অভিনন্দন! আপনি এখন পঁচিশ বছরের যুবক।

বরুণবাবু যন্ত্রকেই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আবার যখন বুড়ো হব তখন ফের বয়স কমানো যাবে কি?

পর্দায় ফুটে উঠল, আর কখনোই পঁচিশের বেশি বয়স হবে না আপনার। যেমন আছেন তেমনই চিরকাল থাকবেন।

চিরকাল বলতে?

চিরকাল বলতে চিরকাল। ইটারনিটি।

উরেব্বাস! তাহলে কতদিন বাঁচবো?

চিরকাল।

হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক এসব হবে না?

কস্মিনকালেও নয়।

খুব রিচ খাবার খেলেও নয়?

খাবার কেন খাবেন?

খাবো না?

না। আপনার আর কখনো খিদেই হবে না।

বলেন কী?

খিদে হবে না, ঘুম পাবে না, ক্লান্তি আসবে না।

বটে! তাই তো আমার খিদের ভাবটা আর টের পাচ্ছি না, না?

কখনো পাবেন না।

তাহলে পুষ্টি হবে কী করে?

শরীরে ক্ষয় না হলে, পূরণেরই বা কী প্রয়োজন?

আচ্ছা জলতেষ্টা পাবে তো?

কেন পাবে?

বাথরুমও তো পাবে, তখন শরীরের জল বেরিয়ে যাবে না?

বাথরুমও পাবে না।

বড়ো বাইরে বা ছোটো বাইরে কোনোটাই নয়?

না।

ব্যায়াম করার দরকার আছে কি?

করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই।

আচ্ছা ধরুন কেউ যদি আমাকে গুলি করে, কি ছোরা মারে বা আমি যদি আগুনে পুড়ে যাই তাহলেও মরব না?

না। আমাদের বায়োনিক ল্যাবরেটরির অটোমেটিক মেশিন আবার আপনার সব কিছু নতুন করে দেবে। আপনি কিছুতেই মারা যেতে পারবেন না এখানে।

ব্যথা তো লাগবে।

তাও লাগবে না। ব্যথার স্নায়ু এখানে আনন্দের তরঙ্গ তোলে, ব্যথার নয়।

ওরে বাবা! এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড দেখছি!

কিছুই সাঙ্ঘাতিক নয়। খুব সোজা ব্যাপার।

আমি কিন্তু খুব ঘুম—কাতুরে মানুষ।

শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুমোনো অসম্ভব।

আর একটা কথা। পৃথিবীতে আমার বউ আর ছেলেপুলে, আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তাদের কথা তো আমার মনে পড়বে!

পড়বে। স্মৃতিঘর বলে একটা চেম্বার আছে। সেখানে গিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে যেকোনো স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবেন। আবার যেকোনো স্মৃতিকে জাগিয়েও তুলতে পারবেন। আপনার যা ইচ্ছা।

মন যদি খারাপ হয়?

এখানে মন খারাপ হয় না। পাশেই আনন্দ—ঘর আছে। সেখানে গিয়ে আনন্দের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

সবসময়ে আনন্দে থাকতে পারব?

অবশ্যই।

এ সময়ে দরজা খুলে ধৃতি ঘরে ঢুকল। বলল, বাঃ, এই তো যুবক হয়ে গেছেন।

আচ্ছা, আমি যদি আর একটু সুপুরুষ হতে চাই?

কোনো বাধা নেই। আসুন।

এরপর ধৃতি তাঁকে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপুরুষ করে দিল। আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পৃথিবীর স্মৃতি খানিকটা আবছা করে দিল।

সব হয়ে যাওয়ার পর বরুণবাবু বললেন, এবার কী হবে ধৃতি?

এখানে তো কিছুই হয় না।

একটা কাজ—টাজ কিছু দেবে না?

কাজ অনেক আছে। সেগুলো সবই যন্ত্র—মানুষেরা করে। ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন।

কিন্তু আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং জানি না।

চিন্তা নেই। বলে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মস্তিষ্ক চালু করা হল বরুণবাবুর। তিনি দিব্যি কলকবজার ব্যাপার বুঝতে শুরু করলেন।

যদি ডাক্তার হতে চাই?

তাও পারেন।

কবি?

তাও।

নাঃ, এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ। এখানকার মানুষেরা তাহলে বেশ আরামেই আছে বলো! তোফা আছে।

মানুষ! এখানে মানুষও নেই।

ওই যে কতজনকে দেখছি। কাজ—টাজ করছে।

কেউ মানুষ নয়। সব যন্ত্রের তৈরি।

বরুণবাবু আঁতকে উঠে বললেন, বলো কি হে! মানুষ কি তাহলে তুমি একা! অ্যাঁ!

ধৃতি একটু হেসে বলে, তাও নই!

মানে?

আমিও মানুষ নই বরুণবাবু। যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কোনো মানুষ নেই। একসময়ে ছিল। তারা আমাদের হাতে এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য গ্রহে, নীহারিকার ওপাশে অন্য নীহারিকায় চলে গেছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন মানুষ বড়ো দরকার ছিল। তাই আপনাকে আনা।

অ্যাঁ!

ভয় পেলেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার যে ভয় হচ্ছে।

ওই একটা জিনিসকেই আমরা জানতে চাই। ভয়। মানুষের ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি। কেন পারিনি তা জানার জন্যই আপনাকে আনা।

বরুণবাবু হঠাৎ বিকট গলায় বললেন, তাহলে কি এই গ্রহে আমি একা একটা মানুষ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরে বাবা রে! আমি কিছুতেই এখানে থাকব না ...কিছুতেই না... ও ভাই ধৃতি, শীগগির আমাকে আমার নোংরা পৃথিবীতেই দিয়ে এসো। রোগ—ভোগ বয়স মৃত্যু ওসব নিয়েই আমি থাকতে চাই... ও ভাই ধৃতি, তোমার পায়ে পড়ি ...

এসপ্লানেড আ গয়া বাবু। উঠিয়ে।

পটাং করে চোখ মেললেন বরুণবাবু। ট্রাম এসপ্লানেডে এসে গেছে। চোখ কচলে তিনি চারদিকে চাইলেন। যা দেখছেন তা অতি সত্য। এ কলকাতাই বটে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন।

মস্ত একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন তিনি। নেমে পড়লেন। মনটায় বড়ো আনন্দ হচ্ছে।

শ্যামবাজারমুখো একখানা বাসে উঠে দেখলেন, বেশ লোকজন আছে। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই আনন্দের চোটে বললেন, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি মশাই!

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

জন্মান্তর

তুলসীদাস গোঁসাই তার ক্যাপসুলের মধ্যে খুবই দুঃখিতভাবে বসে আছে। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ কাচের আবরণ দিয়ে বাইরের বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছে। ক্যাপসুলের চারদিকেই কালো গহন আকাশ। উজ্জ্বল সব নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। সৌরমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে হলেও এখান থেকে মটরদানার আকারে সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দেখছে কে? এই একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল তুলসীদাসের।

ক্যাপসুলের ভিতরটা বেশ আরামদায়ক। গরম বা ঠান্ডা কিছুই নেই। যে আসনটিতে তুলসী বসে আছে তার নাম ইচ্ছাসন। অর্থাৎ ইচ্ছামতো আসনটি চেয়ার, ইজিচেয়ার, বিছানা সব কিছু হয়ে যায়। শরীর যেমন অবস্থায় থাকতে চাইবে আসনটি তেমনই হয়ে যাবে। ক্যাপসুলের মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি কিছু নেই। কয়েকটা লিভার আর বোতাম রয়েছে। একটা টেলিফোনও আছে। সেই টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে। কাজের কথাই হবে। তুলসীর আজ কাজে মন নেই। তার সামনে একখানা পঞ্জিকা খোলা রয়েছে। আগামীকাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যতবার পঞ্জিকার দিকে চোখ যাচ্ছে ততবার বুকখানা ছাঁত ছাঁত করে উঠছে। তুলসীদাসের কোনো বোন নেই।

গত দশ বছর যাবৎ মহাজাগতিক অতিকায় ভাসমান গবেষণাকেন্দ্রে তুলসী কাজ করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ও পুনর্গঠন। এ কাজ করতে গিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত কম্পন বিশ্লেষণ করতে করতে সে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে যে, মানুষ মরে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং করেও। গত দু—বছর সময়ের বাধা ভেদ করা নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে তার ফলে অতীত বা ভবিষ্যতে সময়ের গাড়ি করে যাতায়াত আর শক্ত নয়। মুশকিল হচ্ছে, এসব অত্যন্ত গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে আছে। তুলসী চেয়েছিল সে তার পূর্ব জন্মে ফিরে গিয়ে তার কোনো বোন ছিল কিনা তা খুঁজে দেখবে এবং তার হাতে ভাইফোঁটা নিয়ে আসবে। কিন্তু গবেষণাগারের প্রধান প্রজ্ঞাসুন্দর কেন যেন কিছুতেই তাকে ওই বিপজ্জনক কাজের অনুমতি দিচ্ছেন না।

টেলিফোনটা বার বার সংকেত দিচ্ছে। অগত্যা যন্ত্রটা চালু করে তুলসী রাগের গলায় বলে, কী চাই?

প্রজ্ঞাসুন্দর বলল, তোর হয়েছেটো কী বল তো! সকাল থেকে কোথায় গিয়ে বসে আছিস? এখানে কত কাজ পড়ে আছে! মহাকাশে কতগুলো গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেল, তথ্যগুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার। পৃথিবী থেকে তাগাদা আসছে।

আমার মন ভালো নেই প্রজ্ঞাদা। তোমরা তোমাদের মহাকাশ নিয়ে থাকো। আজকের দিনটা আমাকে ছুটি দাও।

তাই কী হয়? তুই ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? মাত্র একাত্তর লাইট ইয়ার দূরে একটা নক্ষত্র কিছুক্ষণ আগে ফেটে গেল বলে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

ধুস, নক্ষত্রটা ফেটেছে তা মিনিমাম একাত্তর বছর আগে। ওরকম কতই ফাটছে। আমার ভালো লাগছে না এসব আকাশি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে।

লক্ষ্মী ভাইটি! একবার আয়। মহাজাগতিক কম্পন তুই ছাড়া আর যে কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। তোর মিমিক যন্ত্র তো আর কারও পক্ষে অপারেট করা সম্ভব নয়।

বেজার মুখে তুলসী একটা বোতাম টিপল। তার ক্যাপসুল ছুটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই বিশাল মহাকাশ স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে নামল।

মহাকাশ স্টেশনটি একটি সূক্ষ্ম কিন্তু ঘাতসহ আবরণ দিয়ে ঢাকা। মহাজাগতিক রশ্মি বা উল্কাপিণ্ড কোনোটাই একে আঘাত করতে পারে না। একশো মাইল চওড়া ও দেড়শো মাইল লম্বা এই মহাকাশ স্টেশনে গবেষণাগার থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্র, পুকুর থেকে শুরু করে ফুটবলের মাঠ সবই আছে। প্রচুর গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, পতঙ্গ, একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে রেখেছে। থিয়েটার হল, অপেরা, পার্ক, জিমনাসিয়াম কিছুরই অভাব নেই!

তুলসী তার গবেষণাগারে পৌঁছে মিমিক যন্ত্র দিয়ে বিস্ফোরক নক্ষত্রটির খোঁজখবর নিল এবং তথ্য রেকর্ড করে রাখল। তারপর প্রজ্ঞাকে টেলিফোন করে বলল, আমি ছুটি চাই।

ও বাবা! ছুটি চাস কেন?

আর ভালো লাগছে না, কালই আমি পৃথিবীতে ফিরে যাব।

প্রজ্ঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝেছি, তুই ওই ভাইফোঁটা ভুলতে পারছিস না তো! ঠিক আছে, তোকে একদিনের জন্য জন্মান্তরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু যন্ত্রটা এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্তরে আছে। তুই—ই ওটা আবিষ্কার করেছিস বলে তোকে একটা অগ্রাধিকার দিলাম। পরশু ফিরে আসবি কথা দিয়ে যা।

কথা দিচ্ছি।

তুলসী মহানন্দে তার গবেষণাগারের ভূগর্ভে অত্যন্ত গোপনীয় আর একটা প্রকোষ্ঠে ঢুকল। সেখানে টাইম ক্যাপসুল এবং ডাটা ব্যাঙ্ক রয়েছে। তুলসী অনেকক্ষণ ধরে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করতে লাগল। নিজের দেহে নানা কম্পন ও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে ঢুকিয়ে দিতে লাগল ডাটা ব্যাঙ্কে। প্রায় চার—পাঁচ ঘণ্টা পর কম্পিউটার একটা তথ্য দিল। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বনগ্রামে অমিত চ্যাটার্জি বলে একজন লোক ছিল। সম্ভবত সে—ই তুলসী, আগের জন্মের তুলসীদাস গোঁসাই।

টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে নিজেকে পাঁচ শতাব্দী পিছনে নিক্ষেপ করল তুলসী। অভিজ্ঞতাটা নতুন। হুহু করে শরীর বিধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব বিবর্তন আবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তুলসী হয়ে যাচ্ছে অমিত।

টাইম ক্যাপসুলকে তুলসী চালনা করল পৃথিবীতে। মহাকাশ স্টেশন থেকে এক লহমায় যন্ত্রটি তাকে নামিয়ে আনল পৃথিবীর আকাশে। তবে পাঁচশো বছর আগেকার পৃথিবী, সবুজ, গরিব, মন্থর পৃথিবী।

বনগ্রাম বা বনগাঁ। খুঁজে পেতে দেরি হল না তার। তারিখটাও ঠিক করে নিল।

যন্ত্র থেকে বাইরে এসে যন্ত্রটাকে ভিন্ন কম্পনে অদৃশ্য করে রেখে সে নেমে এল। সে যদি অমিত চ্যাটার্জি হয়ে থাকে তবে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার তুলসী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে সে পুরোপুরি অমিত চ্যাটার্জির মধ্যে ঢুকে যাবে। তখন শুধু একটা নম্বর মনে থাকবে তার। ওই নম্বরটা তাকে আবার তুলসীদাসে পরিণত করতে এবং পাঁচশো বছর পরবর্তী ভবিষ্যতে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

মাটিতে পা রাখার আগে প্রকম্পিত বুকে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর মাটিতে পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভীষণ কেঁপে উঠল তুলসীর। প্রবল একটা ঝাঁকুনি।

তারপরই সে দেখল, সে একটা আসনে বসে আছে! সামনে ধান দূর্বা প্রদীপে সাজানো থালা। কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে, একটি কিশোরী মেয়ে বলে উঠল, এই দাদা! ঘুমোচ্ছিস নাকি? মুখটা তোল।

তুলসী ওরফে অমিত একগাল হাসল। হ্যাঁ, এই তো তার বোন শুভ্রা। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ওই তো মা দাঁড়িয়ে আছে।
তুলসী ওরফে অমিত মুখ তুলল, শুভ্রা কী সুন্দর করে যমদুয়ারে কাঁটা দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিল। এগিয়ে দিল নাড়ু মোয়া মিষ্টির রেকাবি। পাঞ্জাবির কাপড় আর ধুতি।

মহাকাশ স্টেশনে পাঁচশো বছর পরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সে কথা পরে। তুলসী মহানন্দে হাসতে লাগল আপাতত। তার সব গবেষণা দারুণভাবে সার্থক। জন্মান্তর এবং সময় সীমা দুইয়েরই রহস্য ভেদ হয়ে গেছে।

জয়রামবাবু

জয়রাম বোস নস্যির ডিবেটা মঙ্গলগ্রহে ফেলে এসেছেন। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। তাড়াহুড়োয় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যে—রকেটটা ভাড়া করেছেন, সেটা আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়া পারাপারের। সৌরমণ্ডলের জন্য আলাদা ধীরগতির রকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার সময় এটাকেই কাছেপিঠে দেখতে পেয়ে হাতঘড়িতে লাগানো ট্রানসরিসিভারের সংকেতে নামিয়ে এনেছিলেন। পাইলট ফাঁকতালে ছোটো খেপের সওয়ারি পেয়ে কিছু বাড়তি লাভের আশায় আপত্তি করেনি বটে, তবে সে নস্যির ডিবের জন্য এখন ফিরে যেতেও নারাজ। জয়রাম কথাটা তুলতেই লোকটা বলল, 'ও বাবা, আমাকে আর সাত মিনিটের মধ্যে নেবুলার ওধারে রওনা হতে হবে। আমার এ রকেট সেকেন্ডে মাত্র দু কোটি মাইল যায়। সৌরমণ্ডল বলে আরও আস্তে চালাচ্ছি। দেরি করতে পারব না।'

জয়রাম খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়ার মাঝিরা একটু ডাঁটিয়াল হয়েই থাকে। তবে নস্যির ডিবের জন্য জয়রামের একটু উশখুশ রয়েই গেল।

জয়রামের বাড়ি একটি ভাসমান বাসগৃহ। পৃথিবীতে আর বাড়ি করার জায়গা নেই। মাটির তলাতেও আধমাইল গভীরতা পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়িঘর। অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাধ্যাকর্ষণ—নিরোধী বাড়ি তৈরি করে আকাশে ছাড়া হয়েছে। তা বলে বাড়িগুলো ভেসে বেড়ায় না, শূন্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম স্থির হয়ে থাকে। এইসব বাড়িতে বাতাস থেকে জল এবং সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভালো ব্যবস্থা আছে। শুধু মাঝে—মাঝে হাটবাজার করতে পৃথিবীতে নামতে হয়।

জয়রামের বাড়ির সামনে একটা খোলা রক। তার ওপর দাগ কেটে জয়রামের ছোটো মেয়ে বুঁচি এক্কাদোক্কা খেলছে। রকেটটা সেই রকের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই জয়রাম ভাড়া মিটিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন। বুঁচি 'বাবা' বলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

মেয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় জয়রাম টাল সামলাতে না পেরে পড়ো—পড়ো হয়ে পড়েই গেলেন নীচে। নীচে বলতে যদি সত্যিই পৃথিবীর বুকে গিয়ে নড়তে হয়, তবে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিন্তু আকাশবাড়িতে যারা থাকে তাদের সকলকেই মাধ্যাকর্ষণ—নিরোধী পোশাক পরতে হয়। জয়রাম তাই পড়েও পড়লেন না। শূন্যে একটু ভেসে সাঁতরে আবার বাড়ির রকে এসে উঠলেন। মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে দেয়ালজোড়া টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে বললেন, আমি এখন টেলিভিশন দেখব। চ্যানেল চার, ব্যান্ড সাত। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিপ্রতিক্রিয়ায় টেলিভিশনে ছবি ভেসে উঠল। জোর খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক রাখোহরির টিমের সঙ্গে যন্ত্রবিদ ফসটারের টিমের ফুটবল ক্যালকুলেশন ম্যাচ। দু—দলে এগারো জন করে বাইশ জন বাঘা

কম্পিউটার রয়েছে। তারা বলটাকে এক বিশাল আয়তক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় চালনা করছে। রাখোহরির লেফট উইং বেঁটে কম্পিউটার গদাই বলটাকে নিউট্রাল জোনে ঠেলে দিতেই ফসটারের গোল কম্পিউটার ব্যারেল সেটাকে ধরে লেফট হাফ মজবুত—গড়নের গরডনের কাছে পাঠাল। রাখোহরির চকিত—চিন্তা কম্পিউটার বলটাকে ধরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণে নিখুঁত ঠেলে দিতেই ফসটারের পাগলা কম্পিউটার মুনস্ট্রাক আর রাখোহরির ঠান্ডা—মাথার কম্পিউটার শীতলচন্দ্রের জোর সংঘর্ষ।

জমে উঠেছিল খেলাটা। কিন্তু জয়রামের গিন্নি সৌরচুল্লিতে কয়েক সেকেন্ডের ভিতর একবাটি সুজি করে এনে দিয়ে বললেন, 'এক ছিটে আনাজপাতি নেই। বাজারে যাবে না?'

জয়রাম উঠলেন! অতিবেগুনি রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে সুজি খেয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আসল সুজি নয়, কৃত্রিম সুজি, তাই মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল।

গ্যারেজে ঢুকে ছোটো ভারটিকাল বিমানটি বের করে নিয়ে পৃথিবীর বুকে রওনা হলেন। তাড়া নেই। আস্তে—আস্তে যাচ্ছেন। আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি ভাসছে। দত্তগিন্নি একটা মহাজাগতিক রশ্মি আটকানোর ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে ডালের বড়ি শুকোতে দিচ্ছেন। বুড়ো চাটুজ্যের বড়ো বদভ্যাস। রকে দাঁড়িয়ে নাক ঝাড়ল নীচে। পড়শি খলিলভাই বাজার করে ছেলে—মেয়ে নিয়ে একটা কাচের হেলিপ্লেনে ফিরছিলেন। তাকে বেতারে জয়রাম চাটুজ্যে বুড়োর বদভ্যাসের কথাটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইভাবেই একদিন দেখো আকাশবাসী আর পৃথিবীবাসীর মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠবে। এখনই সাবধান না হলে—'

নস্যির জন্য নাকটা উশখুশ করছে তখন থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। দুঃখিত মনে জয়রাম প্লেন নিয়ে নিউ ইয়র্কের সুপার মার্কেটে নামলেন। নামে সুপার মার্কেট হলেও সবজি বা আনাজ বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমিতে টান পড়েছে। তাই টাটকা সবজির বদলে আজকাল সিনথেটিক খাবারেরই বেশি চলন, সবজি যা—ও বা কিছু পাওয়া যায়, তা আসে নীহারিকা পুঞ্জের প্রথম পর্যায়ের এক সৌরমণ্ডলের দু—টি বাসযোগ্য বড়ো গ্রহ থেকে। কিন্তু তাতে খরচও কম পড়ে না আর পরিমাণেও তা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ।

জয়রাম ভিড়ে থিকথিক—করা বাজারে ঢুকে দেখলেন এক জায়গায় কিছু টাটকা মানকচু বিক্রি হচ্ছে। তার সামনে বিশাল লাইন। জয়রাম ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু অর্ধেক পথেই কচু ফুরিয়ে গেল। ছুটলেন অন্য জায়গায়, সেখানে কিছু তেলাকুচোর চালান এসেছে। কিন্তু তেলাকুচোও কপালে জুটল না। নস্যির জন্য নাকটা সুড়সুড় করছে কখন থেকে। মঙ্গলগ্রহে হাজার হাজার মাইল খাল খোঁড়ার কাজ তদারক করতে করতে অন্য সব কথা খেয়াল থাকে না। অথচ খাঁটি নস্যি এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। নীহারিকাপুঞ্জের সবুজ গ্রহে কিছু তামাকের চাষ হয়। সেখান থেকে তাঁর বন্ধু পাড়ুরাম বড়ো একটা ডিবে এনে দিয়েছিল। দামও পড়ে যায় বিস্তর।

কাঁচা সবজি না পেয়ে জয়রাম টিনের সিল—করা প্যাকে কৃত্রিম খাবার কিনলেন। গিন্নি ভারি রেগে যাবেন। কিন্তু কী আর করা!

ছাদের দিকে এসকেলেটরে উঠছেন এমন সময় দোকলবাবুর সঙ্গে দেখা।

'কী খবর হে? বাসা কোথায় করলে?' দোকলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে আকাশপুরীর তায়েবগঞ্জে। উত্তর রাশিয়ার ঠিক ওপরেই!'

'বাঃ, সে তো খুব ভালো জায়গা শুনেছি। এখন সেখানে জায়গার দাম কত করে বলো তো? আমার মেজো জামাই একটা জায়গা খুঁজছে।'

'আজ্ঞে তায়েবগঞ্জে আর জায়গা নেই। পাশে নতুন একটা কলোনি হচ্ছে। নাম চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপ, সেখানে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবে প্রতি ঘনফুট বোধ হয় এক লক্ষ ডলার করে পড়বে।'

'তা পড়ুক। জায়গা পাওয়া গেলেই হল।' বলতে বলতে দোকলবাবু পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে 'আঃ' বলে আরামের একটা আওয়াজ করলেন।

ডিবেটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়েছিলেন জয়রামবাবু। এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। নস্যি, নস্যি!

'একটু দেবেন? ওই নস্যিটা?'

দোকলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না। আমার বড়ো জামাই তো সবুজ গ্রহে বাস করে, সে আমাকে পিপে—পিপে নস্যি পাঠায়। যত খুশি নাও।' বলে দোকলবাবু উঁকি মেরে জয়রামের থলিটা দেখে বললেন, 'শাকসবজি কিছু পেলে না দেখছি!'

জয়রাম পরপর দু—টিপ নস্যি টেনে আরামে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে একগাল হাসলেন। বললেন, 'নাঃ। গিন্নির কাছে আজও বকুনি খেতে হবে।'

ছাদে এসে যে যার যানবাহন খুঁজতে যাবেন, তখন দোকলবাবু বললেন, 'এখনও ঢের সময় আছে। আমার বাড়ি তো কাছেই গ্রিসে। চলো একটু বিশ্রাম করে যাবে।'

নিউইয়র্ক থেকে গ্রিসের দূরত্ব এয়ার কারে মাত্র আধ মিনিট। তাই জয়রামবাবু আপত্তি করলেন না। দোকলবাবু তাঁর এয়ার কারের দরজা খুলে বললেন, 'উঠে পড়ো।'

পুরোনো অ্যাথেন্সের বাইরে দোকলবাবুর ছোটো বাড়ি। তবে খুব বড়োলোক ছাড়া বাড়িতে কারও বাড়তি জমি থাকে না। দোকলবাবুর আছে। কাজটা বেআইনিও বটে। দোকলবাবু খুব লুকিয়ে পাঁচিল ঘিরে দশ হাত বাই দশ হাত একটু জমি রেখেছিলেন বাড়ির পিছনে।

জয়রামকে কফি খাইয়ে দোকলবাবু বললেন, 'এসো, তোমাকে তাজ্জব জিনিস দেখাব একটা।' বলে প্রায় হাত ধরে টেনে পিছনের ফালি জমিটায় নিয়ে এলেন জয়রামকে।

জয়রাম থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে থ তিনি।

পৃথিবীতে অতীত কালের মানুষরা মাটিতে কেমিক্যাল সার দিয়ে মাটিকে পাথরের মতো শক্ত আর জমাট করে দিয়ে গেছে। তাতে আর চাষ হয় না, সেচ চলে না, লাঙলই ঢুকতে চায় না। গাছপালা বলে কিছুই প্রায় নেই। ফালতু জমিও নেই যে গাছ লাগানো যাবে। তবে এ কী? দশ বাই দশ হাত জায়গাটায় কচি—কচি ঢেঁকিশাকের মাথা জেগে রয়েছে। কী সবুজ! কী সরস! কী অদ্ভুত!

'ঢেঁকিশাক!' জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন।

দোকলবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'উঁহু, শব্দ কোরো না। টের পেলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

জয়রাম এবার চাপা স্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলে উঠলেন, 'এ যে ঢেঁকিশাক!'

'ঢেঁকিশাকই বটে। অনেক কষ্টে দশ বছরের চেষ্টায় ফলিয়েছি। নেবে ক—টা? নাও। দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি। খবরদার, কাউকে বোলো না কিন্তু!'

'আজ্ঞে না না।' বিগলিত জয়রাম বললেন।

'আর শোনো, ওই চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপে আমার জামাইয়ের জন্যে শ—পাঁচেক ঘনফুট জায়গা জোগাড় করে দিতে হবে।'

ঢেঁকিশাকের দিকে চেয়ে জয়রাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

বারোগাছি ঢেঁকিশাক নিয়ে জয়রাম যখন বাড়িতে ফিরলেন তখনও তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক সম্মোহিত। বিড়বিড় করে কেবল বলছেন, [illegible] [illegible]

দিনকাল

বিলাস গোরু চরাতে হক সাহেবের মাঠে এসেছে। কোঁচড়ে মুড়ি, এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে রিমোট কন্ট্রোল। গোরুদের প্রত্যেকটির কানের কাছে একটি করে রিসিভার যন্ত্র আছে। পাঁচনবাড়ির দরকার হয় না, রিমোটের বোতাম টিপেই ব্যাদড়া গোরুকে বশে রাখা যায়।

হক সাহেবের মাঠটি চমৎকার। সবুজ দেড় বিঘৎ লম্বা পুষ্টিকর ঘাসে ছাওয়া। একসময়ে অবশ্য ন্যাড়া বালিয়াড়ি ছিল। প্রায় দুশো বছর আগে, অর্থাৎ বাইশ শো তেষট্টি সালে অজিত কুণ্ডু নামে এক বৈজ্ঞানিক তাঁর বিখ্যাত যান্ত্রিক ইঁদুর আবিষ্কার করলেন। ছোটো ছোটো যন্ত্রের ইঁদুর মাটিতে গর্ত করে দশ—পনেরো—বিশ মিটার নীচে নেমে যায় আর সেখান থেকে মাটি তুলে এনে ওপরে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে বালিয়াড়ি, সাহারা বা কালাহারির মতো মরুভূমি সব অদৃশ্য হয়ে এখন উর্বর মাটি, শস্যক্ষেত্র আর বনে—জঙ্গলে সেসব জায়গা ভরে গেছে। মাটিকে উর্বর আর সরস রাখতে কেঁচো ও জীবাণুদের কাজে লাগানো হয়েছে। ফলটা হয়েছে চমৎকার। হক সাহেবের মাঠটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাশেই রামরতন ঘোষের মস্ত ধানখেত। খেতের পাশে একটা বেলুন চেয়ারে বসে রামরতন তার রিমোট কন্ট্রোলে খেতে ধান রুইছে। রামরতনের রোবট—যন্ত্রটি দেখতে অবিকল একটা বাচ্চচা মেয়ের মতো। প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে। যন্ত্র—বালিকা ঠিকমতোই ধান রুইবে। তবে রামরতনের যন্ত্র—বালিকাটির দোষ হল, চোখের আড়াল হলেই খানিকটা এক্কা—দোক্কা খেলে নেয়। হয়তো আগে অন্যরকম প্রোগ্রাম করা ছিল, সেটা পুরোপুরি তুলে না দিয়েই নতুন প্রোগ্রাম বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রামরতনের একটু ঝামেলা হচ্ছে।

বিলাস তার নাইলনের ব্যাগ থেকে চোপসানো একটা বেলুনের মতো জিনিস বের করল। একটা খুদে সিলিন্ডারের নজল বেলুনের মুখে চেপে ধরতেই লহমায় বেলুনটা ফুলে একটা ভারি সুন্দর আরামের চেয়ারে পরিণত হল। বিলাস চেয়ারে বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খেতে খেতে হাঁক মারল, ও রামরতনদাদা, বলি করছোটা কী?

রামরতন তার দিকে চেয়ে বিরক্ত মুখে বলল, চার একর জমিতে ধান রুইতে বড়ো—জোর আধঘণ্টা লাগবার কথা। আর ওই বিচ্ছু মেয়ে ঝাড়া দু—ঘণ্টায় এক একরও পারেনি।

বিলাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দাও না। যন্তর তো তোমার হাতেই রয়েছে।

রামরতন বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে তো কথাই ছিল না। এঁর তো গুণের শেষ নেই। যেই স্পিড বাড়াব অমনি ফাঁক ফাঁক করে বুনতে শুরু করবে। তাতে কাজ বাড়বে বই কমবে না।

যন্তরটা তাহলে তোমাকে খারাপই দিয়েছে। বদল করে নাও না কেন?

রামরতন এবার তার চেয়ারে লাগানো নম্বরের প্লেটে একটা নম্বর টিপল। তার চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে বিলাসের চেয়ারের পাশে এসে নামল। রামরতন টিসু কাগজে মুখ মুছে বলে, সে চেষ্টা

কী আর করিনি নাকি? ও মেয়েকে তুমি চেনো না। যন্ত্র—বালিকা হলে কী হয়, মাথায় খুব বুদ্ধি। চার মাস হল কিনেছি গুচ্ছের টাকা দিয়ে, দু—বছরের গ্যারান্টি আছে। কাজে দোষ হলে বদলে দেবে বা টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু এ মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে বাবা বলে, আর আমার গিন্নিকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। চালাকিটা দেখেছ? এখন আমার গিন্নির এত মায়া পড়ে গেছে যে মৃগনয়নীকে ফেরত দেওয়ার কথা শুনলেই খেপে ওঠেন।

মৃগনয়নী কি ওর নাম?

আমার গিন্নির দেওয়া। মেয়েটাকে নিয়ে জেরবার হচ্ছি। ওই দেখ, আবার খেলতে লেগেছে।

বাস্তবিকই মৃগনয়নী ধান রোয়া ফেলে একটা স্কিপিং দড়িতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। মুখে হাসি।

রামরতন রিমোটটা তুলে ধরে বোতাম টিপে মেয়েটাকে ফের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বলল, সারাক্ষণ এই করতে হচ্ছে। সকালে পান্তাভাত খেয়ে এসেছি, কোথায় একটু ঝিম মেরে চোখটি বুজে থাকব, তার উপায় নেই।

ফেরত না দাও, রিপ্রোগ্রামিং করিয়ে নিলেই তো পারো। ওরা ডিস্কটা ভালো করে পুঁছে আবার প্রোগ্রাম করে দেবে।

রামরতন বিমর্ষ মুখে বলে, সে চেষ্টাও কী আর করিনি? গিন্নি তাও করতে দিচ্ছে না। বলে, ও যে দুষ্টুমি করে, খেলে তাতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এ সময়টায় একটু ভাত—ঘুম ঘুমিয়ে না নিলে আমার শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করে।

রামরতন গোটা দুই হাই তুলল দেখে বিলাস সমবেদনার সঙ্গে বলল, একটা হর্ষ—বড়ি খেয়ে নেবে নাকি? তাহলে বেশ চাঙ্গা লাগবে। আমার কাছে আছে।

রামরতন মাথা নেড়ে বলে, না রে ভাই। সেদিন একটা খেয়ে যা অবস্থা হল, আনন্দের চোটে এমন নাচানাচি, লাফালাফি, চেঁচামেচি করেছি যে পরে গা—গতরে ব্যথা হয়ে, গলা ভেঙে কাহিল অবস্থা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিলাস বলে, তা তোমার তো প্লাস্টিকের হার্ট, তুমি কাহিল হয়ে পড়ো কেন? প্লাস্টিকের হার্টওলা লোকেরা নাকি সহজে কাহিল হয় না।

সে কথা ঠিক। তবে আমার কপালটাই তো ওরকম। যে হার্টটা বসানো হয়েছে সেটা নাকি বাঙালিদের ধাত অনুযায়ী টিউন করা হয়, তখন বাঙালি হার্টের সাপ্লাই ছিল না বলে আমাকে একটা জার্মান হার্ট লাগিয়ে দিয়েছে, সেটা একটু বেশি শক্তিশালী। ফলে আমার শরীরের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। মাস তিনেক বাদে বাঙালি হার্ট এলে এটা বদলে দেবে বলেছে।

দু—জনে কথা হচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে একটা গোলগাল মেঘ দেখা দিল, আর ছ্যাড় ছ্যাড় করে বৃষ্টি হতে লাগল।

বিলাস চমকে উঠে বলে, আরে! বৃষ্টি হচ্ছে কেন? এখন তো বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়! দেখ তো, মুড়িগুলো ভিজে গেল!

আমারও আবার সর্দির ধাত। বলে রামরতন হাতের রিমোটটা উলটে নম্বর ডায়াল করতে লাগল। রিমোটটার উলটো পিঠটা টেলিফোনের কাজ করে।

রামরতন বলল, হাওয়া অফিস? তা ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে এখন বৃষ্টি হওয়াচ্ছেন কেন? আমরা তো বৃষ্টি চাইনি।

হাওয়া অফিস খুব লজ্জিত হয়ে বলে, এঃ হেঃ সরি, একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা হওয়ার কথা সাহাগঞ্জের মাঠে। ঠিক আছে আমরা মেঘটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মেঘটা হঠাৎ একটা চক্কর খেয়ে ভোঁ করে মিলিয়ে গেল। আবার রোদ দেখা দিল।

বিলাস ক্ষুব্ধ গলায় বলে, হাওয়া অফিসটা আর মানুষ হল না। সব সময়ে ক্যালকুলেশনে ভুল করে যা নয় তাই ঘটিয়ে দিচ্ছে। এ হল ফিনল্যান্ডের বাবু—মুড়ি, জল লাগলেই গলে যায়।

ওই তো কত ফিরিঅলা উড়ে বেড়াচ্ছে। একটাকে ডেকে মুড়ি কিনে নে না।

বাস্তবিকই আকাশে ইতস্তত কয়েকটা বাটির মতো আকারের জিনিস শ্লথ গতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের তলায় কোনোটায় লেখা জলখাবার, কোনোটায় লেখা প্রসাধন—সামগ্রী, কোনোটায় লেখা বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামত ইত্যাদি।

বিলাস বাঁশিটা মুখে নিয়ে বাঁশির গায়ে একটা বোতাম টিপে ফুঁ দিল। কোনো শব্দ হল না। কিন্তু আকাশ থেকে একখানা বাটি নেমে এসে তার সামনে থামল। বাটিতে মেলা খাবার জিনিস সাজানো। দোকানি একজন বুড়ো—মানুষ। বলল, কী চাই?

ফিনল্যান্ডের বাবু—মুড়ি আছে নাকি?

ফিনল্যান্ডের মুড়ি আবার মুড়ি নাকি? যন্তরে মুড়ি আছে, একবার খেলে জীবনে আর স্বাদ ভুলতে পারবে না। নাম হল উড়ুক্কু মুড়ি।

আজকাল নিত্যি নতুন জিনিস বেরোচ্ছে। উড়ুক্কু মুড়ি বিলাস খায়নি। নিল এক প্যাকেট। দাম নিয়ে বুড়ো বাটি সমেত ফের আকাশে উঠে গেল।

বিলাস একমুঠো মুখে দিয়ে দেখল, চমৎকার, চিবোতে না চিবোতেই যেন মুখে মিলিয়ে যায়। স্বাদটাও ভালো।

ওরে ও বিলাস, তোর কেলে গোরু যে আমার খেতে ঢুকে যাচ্ছে, এখনই সব তছনছ করবে। ওটি সাঙ্ঘাতিক দুষ্টু গাই।

বিলাস তাড়াতাড়ি রিমোট তুলে বোতাম টিপতেই কেলে গোরুটা থমকে একটু শিং নাড়া দিল। তারপর সুরসুর করে আবার ফিরে এসে ঘাস খেতে লাগল। বিলাস বলল, রামরতনদা, তোমার রিমোটটা আমাকে দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি মৃগনয়নীকে সামলে রাখব'খন।

বাঁচালি ভাই, এই নে, বলে রিমোটটা বিলাসকে দিয়ে রামরতন সবে চোখ বুজেছে এমন সময়ে হঠাৎ মৃগনয়নী কাজ ফেলে দুড়দাড় করে দৌড়ে এল।

ও বাবা!

রামরতন বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে বলল, কী বলছিস?

ভূতে ঢেলা মারছে যে!

অ্যাঁ!

এই অ্যাত বড়ো বড়ো ঢেলা। এই দেখ। বলে মৃগনয়নী একটা ঢেলা হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

আর এই সময়েই আরও দু—চারটে ঢেলা ওদিকার খেত থেকে উড়ে এসে আশেপাশে পড়ল। ব্যাপারটা নতুন নয়, আগেও দু—চারবার হয়েছে। রামরতন শুকনো মুখে বিলাসের দিকে চেয়ে বলে, কী করি বল তো!

বিলাস বলল, কার ভূত?

তা কী করে বলব?

দাঁড়াও, থিওসফিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।

বিলাস ডায়াল করে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে কার ভূত দৌরাত্ম্য করছে তা জানেন?

ও হল ষষ্ঠীচরণ সাহার ভূত। ওকে চটাবেন না।

কিছু একটা করুন। খেতের কাজ যে বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সে আমাদের কম্ম নয়। ভূতের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে?

তাহলে?

চোখ—কান বুজে সয়ে নিন। কিছু করার নেই।

বিলাস ফোন বন্ধ করে বলে, ষষ্ঠী খুড়োর ভূত। কেউ কিছু করতে পারবে না।

রামরতন একটু খিঁচিয়ে উঠে মৃগনয়নীকে বলে, তোর এত আদিখ্যেতা কীসের? ঢেলা পড়ছে তো পড়ুক না। তোর তো আর ব্যথা লাগবার কথা নয়!

মৃগনয়নীর চোখ ভরে জল এল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না লাগেনি বুঝি! এই দেখ না কনুইয়ের কাছটা কেমন ফুলে আছে।

সত্যিই জায়গাটা ফোলা দেখে রামরতনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিলাসের দিকে চেয়ে বলল, এ কী রে? রোবটেরও যে ব্যথা লাগছে আজকাল।

বিলাস বলল, শুধু কী তাই? চোখে জল, ঠোঁটে অভিমান, নাঃ, দিনকাল যে কীরকম পড়ল!

রামরতন মৃগনয়নীকে বকবে বলে বড়ো বড়ো চোখ করে ধমকাতে যাচ্ছিল, মৃগনয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না কেন বাবা?

রামরতনের রাগ জল হয়ে গেল। ঠিক বটে, সে মানুষ আর মৃগনয়নী নিতান্তই যন্ত্র—বালিকা। কিন্তু সবসময়ে কি আর ওসব খেয়াল থাকে? রামরতন হাত বাড়িয়ে মৃগনয়নীকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কাঁদিসনে মা, আজ তোকে খুব সুন্দর একটা ডলপুতুল কিনে দেবো।

বিলাস মুখটা ফিরিয়ে একটু হাসল।

পাগলা গণেশ

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমনকী কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দু—টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি।

সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না। ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়।

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক—আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তা ছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উলটোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

ক—দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো। বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উলটে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোটো ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতি বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনো প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!

হ্যাঁ। কবিতা। পড়ো।

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক—খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কী বুঝলে?

লোকটা অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশো একান্ন বছর।

বাচ্চচা ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ...কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস...আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ— শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।—

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—

গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়োসড়ো পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার!

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দু—জনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না!

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি, বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল। লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ, তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

ফুটো

দোলগোবিন্দবাবু দুঃখী মানুষ। বরাবরই তাঁর দুঃখে কেটেছে। ছেলেবেলায় গরিব বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি—মোয়া বিক্রি করে পেট চালিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন অতি কষ্টে। এই পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ বছরের জীবনটা তাঁর আজও বেশ দুঃখেই কাটে। অল্প মাইনের একটা চাকরি করেন। ঘরে তাঁর বউ দিনরাত গঞ্জনা দেন। ছেলে—মেয়ে দুটো ভারী রোগা—ভোগা। অফিসেও তাঁকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভালোমানুষ বলে বেশি করে খাটিয়ে নেয়। দোলগোবিন্দবাবু নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। তাঁর অফিস বলতে একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি। নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কালি, ইঁদুরমারা বিষ, নানারকম সিনথেটিক আঠা। দোলগোবিন্দবাবু একজন সামান্য কেমিস্ট। ক—এর সঙ্গে ফরমুলা অনুযায়ী খ মিশিয়ে গ তৈরি করা আর কী। তবে মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন একা একা বসে কাজ করেন তখন তাঁর ইচ্ছে যায়, নানারকম জিনিসের সঙ্গে নানারকম বেখাপ্পা জিনিস মিশিয়ে দেখলে কেমন হয়? এরকম মিশিয়ে দেনও কয়েকবার। তেমন কিছু দাঁড়ায়নি।

আজও অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাইরে দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর হাওয়া দিচ্ছে। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু র‍্যাক—এ মেলানো তাঁর ছাতাটা নিতে গিয়ে একটু অবাক হলেন। বাঁ—দিকের দ্বিতীয় হুকটায় তিনি বরাবর তাঁর ছেঁড়া তাপ্পি—দেওয়া ছাতাটা ঝুলিয়ে রাখেন। আজও রেখেছেন। অথচ ছাতাটা নেই। তার বদলে একটা খুব ঝকমকে নতুন ছাতা ঝুলছে। শুধু নতুন নয় বেশ কায়দার ছাতা। কালো বাঁকানো পুরু হ্যান্ডেল, দারুণ দামি কাপড়, ওজনেও সাধারণ ছাতার চেয়ে পাঁচগুণ ভারী। র‍্যাক—এ আর দ্বিতীয় ছাতা নেই। অফিসের সবাই কখন বাড়ি চলে গেছে।

দোলগোবিন্দবাবু দারোয়ান রামবিলাসকে ডেকে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রামবিলাস বলল, আমি তো কিছু জানি না বাবু।

অন্যের ছাতাটা নেওয়া উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তবে ছাতা যারই হোক সে ছাতা নিতে এই দুর্যোগে আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কাল ছাতাটা ফেরত আনলেই হবে। এই ভেবে দোলগোবিন্দ ছাতাটা নিয়ে বেরোলেন।

ছাতাটা ভালো। খুবই ভালো। মাথার ওপর তুলে দোলগোবিন্দ ছাতাটা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে এবং বেশ বিনীতভাবে খুলে গেল। আজকালকার অটোমেটিক ছাতা যেমন অভদ্রভাবে ফটাং করে খোলে সেরকমভাবে নয়।

বৃষ্টি আজ বড়ই প্রবল। রাস্তায় কলকল করে যেন নদী বয়ে চলেছে। বাস—ট্রাম—ট্যাক্সি সব বন্ধ। একটা কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বুঝলেন, আজ জল

ঠেঙিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে দোলগোবিন্দ দেখলেন, সিঁড়ির নীচে তেমন জল নেই। চটি ভিজল না। দোলগোবিন্দও হাঁটতে হাঁটতে আরও টের পেলেন, ছাতাটা এতই ভালো যে চারদিকে প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাস সত্ত্বেও তাঁর গায়ে একটুও ছাঁট লাগছে না, বাতাসও নয়। এত ভালো ছাতা নিশ্চয়ই এদেশে হয় না।

বেশ আনমনেই হাঁটছিলেন দোলগোবিন্দ। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের খোড়ো চলের ঘরে বর্ষাকালে বড়ো জল পড়ত। তাঁরা ঘরে বসে ভিজতেন আর সারা রাত জেগে বসে জড়োসড়ো হয়ে কাটাতেন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, পায়ের নীচে যেন মাটিটা ভালো টের পাচ্ছেন না! হল কী? নীচের দিকে তাকিয়ে উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই কনভেন্ট রোডের রাস্তাটা কোনো যাদুবলে যেন প্রায় দশ হাত নীচে পড়ে আছে। আর তিনি জলে ভেসে আছেন।

না, কথাটা ঠিক হল না। তিনি ঠিক ভেসেও নেই। তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। কোনো বাড়তি শক্তি লাগছে না, চেষ্টা করতে হচ্ছে না, একেবারে গ্যাস বেলুনের মতো দিব্যি উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এই অশরীরী কাণ্ডে দোলগোবিন্দ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঁচাও! গেলুম।

ঝড়—বৃষ্টিতে সেই শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আর শুনলেও লাভ ছিল না। দোলগোবিন্দ তখন মাটি থেকে বিশতলা বাড়ির উচ্চচতায় ঝুলছেন, মানুষ তাঁর কী সাহায্য করতে পারে!

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন দাঁত—মুখ খিঁচিয়ে। ভাবলেন, এটা তো দুঃস্বপ্ন, কেটে যাবে এখুনি।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন কাটল না। দোলগোবিন্দ যখন চোখ খুললেন তখন কলকাতা শহরটা প্রায় মাইলটাক নীচে পড়ে আছে। দোলগোবিন্দ শিব, কালী, হরি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাকার যত দেব—দেবীর নাম মনে পড়ল তাঁদের বিস্তর ডাকাডাকি করতে লাগলেন। একবার ছাতাটা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু লাফালে তাঁর হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা ছাড়া ছাতাটাই যেন তাঁর হাতখানা মুঠো করে ধরে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না।

দোলগোবিন্দ কখনো এরোপ্লেন চড়েননি। উঁচু পাহাড়েও কখনো ওঠেননি। বলতে কী এত উঁচুতে তাঁর এই প্রথম ওঠা। নীচের দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, হাত—পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া ধোঁয়া দেখার অবশ্য দোষও নেই। একটু বাদেই দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে ধোঁয়া নয়, তাঁর চারপাশে মেঘ, আঁতকে উঠে ভিড়মি খেতে খেতেও সজাগ রইলেন দোলগোবিন্দবাবু। মেঘ খুব বিপদের জিনিস। মেঘ থেকেই বিদ্যুৎ চমকায় এবং বাজ পড়ে। কাছাকাছি যদি এখন বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে বড়ো বিপদ।

বেশ কিছুক্ষণ চারপাশ ঘন কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা রইল। দোলগোবিন্দ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, তারপর একসময়ে হঠাৎ আকাশটা হেসে উঠল মাথার ওপর। ঝকমক করছে তারা, বেশ জ্যোৎস্নাও ফুটফুট করছে। পায়ের তলায় পড়ে আছে কোপানো খেতের মতো মেঘের স্তর।

দোলগোবিন্দ আচমকাই দেখতে পেলেন, হাত দশেক দূরে একটা ডিঙিনৌকো বাতাসে ভাসছে। এক হাতে চোক কচলে নিয়ে তাকালেন, না, ঠিক ডিঙিনোকো নয়, একটা অতিকায় পটল। কিংবা...

আর ভাববার সময় পেলেন না। ছাতাটা তাঁকে ধরে এনে ওই অতিকায় পটলের মতো বস্তুটার পিঠে খুব যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ছাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পায়ের নীচে ম্যানহোলের মতো একটা ঢাকনা খুলে গেল এবং তিনি সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে পড়ে গেলেন।

নাঃ, খুব একটা জোরে পড়লেন না। তা ছাড়া যেখানে পড়লেন সেখানে ফোম রবারের মতো গদিও ছিল। শুধু ভড়কে যাওয়ায় মুখ দিয়ে 'আঁক' করে একটা শব্দ বেরিয়েছিল তাঁর।

মহাকাশযান, উফো, ভিন্ন গ্রহের জীব ইত্যাদি সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো দোলগোবিন্দবাবুও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটলের মতো বস্তুটি যে ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে আসা একটি উফো সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই রইল না। উফোর ভেতরটা খুবই বড়োসড়ো এবং নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রপাতি রয়েছে চারদিকে। দিব্যি ঝলমলে আলো জ্বলছে।

দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষ— না, অবিকল মানুষ নয়— অনেকটা মানুষের চেহারার একটা জীব তাঁর দিকে এগিয়ে এল। মানুষের সঙ্গে এর তফাত হচ্ছে এই জীবটার শুঁড় এবং লেজ আছে। বাকিটা মানুষের মতোই। শুঁড়টা হাতির শুঁড়ের মতো অত বড়ো নয়। লেজটা অনেকটাই গোরুর লেজের মতো। লোকটার পোশাক বলতে একটা হাফ প্যান্টের মতো বস্তু, গায়ে একটা জহরকোট গোছের জিনিস।

এদিক—সেদিক আরও কয়েকজন অবিকল একরকম জীবকে দেখতে পেলেন দোলগোবিন্দ, তারা সব তখনও মনোযোগে যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছে।

সামনের জীবটা প্রথমে শুধু দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দোলগোবিন্দবাবুকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা না বুঝলেও কথা বলার মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা আছে।

এরপর জীবটা একটা রেডিয়োর মতো যন্ত্র মুখের কাছে তুলে ধরে কথা বলতে লাগল।

আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা ভাষা।

জীবটা বলল, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি যে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা একটা অনুবাদ যন্ত্র। আমার ভাষাকে তোমার ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো তো?

ঘাবড়ে গেলেও দোলগোবিন্দ ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন শোনো। যে ছাতাটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা আমরাই পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই মহাকাশযানে একটা যন্ত্রের মধ্যে একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফুটো আমরা বন্ধ করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সবজান্তা যন্ত্রমগজের সাহায্য নিই। যন্ত্রমগজ আমাদের তোমার নাম জানিয়ে বলে, একমাত্র এই লোকটাই সেই কেমিক্যাল তোমাদের দিতে পারে যার সাহায্যে ফুটো সারানো সম্ভব। তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।

দোলগোবিন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই, সামান্য ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি কেমিক্যালের কী জানি? জীবটা বলল, ভালো করে ভেবে দেখ। আমাদের যন্ত্রমগজ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ভুলও করে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ও শুধু একটা লোকেরই নাম বলেছে। দোলগোবিন্দ মিত্র। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

দোলগোবিন্দ আকাশ—পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে উনি কিছু আজগুবি মিকশ্চার তৈরি করেছেন, করে সেগুলো বাতিল শিশি বা জারের মধ্যে ভরে নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। তা দিয়ে কোনো কাজ হবে না জেনেও আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন এই ইয়ে, আমি ফুটো বন্ধ করার কোনো কৌশল জানি না। তবে আমার কাছে কয়েকটা আজগুবি মিকশ্চার আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা কাজে লাগবে তা তো জানি না।

জীবটা বলল, আপনি এক্ষুনি আপনার ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ওই ছাতাই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। যদি আমাদের ছিদ্র সারাতে পারেন, তবে আপনাকে আমরা পুরস্কার দেবো।

তাই হল। ফের প্রাণ হাতে করে ছাতার হাতল ধরে ঝুলে রইলেন দোলগোবিন্দ। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দেখলেন, সর্বনাশ, দরজায় তালা দেওয়া।

কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় হাতের ছাতাটা আপনা থেকেই উঠে তালাটায় গিয়ে একটা গুঁতো মারল। সঙ্গে সঙ্গে টক করে খুলে গেল তালা।

ভিতরে আলমারি খুলে মোট পাঁচটা শিশি আর জার হাতে আর বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। ছাতাটা তালায় আর একটা গুঁতো দিতেই সেটা এঁটে গেল। দোলগোবিন্দর হাত আর বগল থেকে শিশি আর জারগুলোও পটাপট চুম্বকের আকর্ষণে ছাতার মধ্যে সেঁধিয়ে শিকগুলোর সঙ্গে লেগে রইল।

ঝুল খেতে খেতে দোলগোবিন্দ এসে সেই মহা পটলের মতো মহাকাশযানে উঠলেন।

সেই জীবটা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুকে খাতির করে নিয়ে গেল।

পটলটার তলার দিকে একটা ধাতব বাক্সের মতো জিনিস আছে। ফুটোটা সেখানেই।

দোলগোবিন্দবাবুর মনে পড়ল যে শিশিটায় সবুজ রঙের ঘন পদার্থ রয়েছে তা থেকে দু—ফোঁটো একবার তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে যায়। পরে সেটা এমন শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল যে তিনি সেটা উকো দিয়ে ঘষেও তুলতে পারেননি। সুতরাং দোলগোবিন্দ আর দেরি না করে সবুজ শিশি থেকে দু—ফোঁটা ফুটোয় ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শক্ত হয়ে জমে গেল।

জীবটা একটা যন্ত্র থেকে তাপ্পি দেওয়া জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিল। আবার একটা পাইপ থেকে ভীষণ ঠান্ডা একটা পদার্থ ছড়াল ওর ওপর। কিন্তু ফুটোর তাপ্পি টিকে রইল।

লেজ ও শুঁড়ওলা জীবটা দোলগোবিন্দর দিকে চেয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, চমৎকার! আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন তা আর বলার নয়। এর জন্য আপনাকে আমরা আমাদের গ্রহের দু—টি অতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। এ দুটো দিয়ে আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারবেন।

জীব ভদ্রলোক দোলগোবিন্দকে দুটো খুদে বাক্স দিলেন। দোলগোবিন্দও ফের ছাতার বাঁট ধরে নেমে নিজের বাসার দোরগোড়ায় নামলেন।

পরদিন সকালে বাক্স দুটো খুলে হাঁ হয়ে গেলেন দোলগোবিন্দ, একটায় খানিকটা কর্কচ লবণ, অন্যটায় একটুখানি চুন। রসিকতা নয় তো!

না। অনেকক্ষণ ভেবে দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন এ দুটো জিনিস সম্ভবত ওই গ্রহে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই ভীষণ মূল্যবান। শুঁড়—লেজওলা জীব বোধহয় জানে না যে পৃথিবীতে ওই দুই বস্তু অঢেল এবং সস্তা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে দোলগোবিন্দর, কিন্তু দমলেন না। সবুজ শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। যেখানে ফুটো পান সেখানেই প্রয়োগ করেন। ছাদের ফুটো, ছাতার ফুটো, বাসনের ফুটো।

ফুটো সারানোয় রীতিমতো নামডাক হতে লাগল তাঁর। ক্রমে নৌকা জাহাজ এরোপ্লেনের ফুটো পর্যন্ত সারাতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

বলা বাহুল্য, দোলগোবিন্দর নাম এখন ফুটোবাবু। কোটি কোটি টাকার মালিক। বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কোনোকিছুরই অভাব নেই।

বিধুবাবুর গাড়ি

বিধুবাবুর একখানা পুরোনো মডেলের অস্টিন গাড়ি আছে। স্পেয়ার পার্টস পাওয়া কঠিন। প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। বুড়ো মিস্ত্রি ইরফান সারিয়ে—টারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বলে, এ গাড়ি আর বেশি দিন নয়। গাড়িটা তাঁর বাবার। বড্ড মায়া। গাড়িটা বেচে দিলে হয়তো কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মায়ার জন্যই পারেন না। পথে—ঘাটে গাড়িটা নিয়ে মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়তে হয়। বাড়িতেও অশান্তি হচ্ছে খুব।

সেইরকমই একটা বিপদে পড়লেন আজ। মফস্সল থেকে কলকাতা ফিরছেন। রাত ন—টা বেজে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি এল। এমন বৃষ্টি যে দু—হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। ওয়াইপারটা কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে সেটাও গেল থেমে। বাড়ি এখনও ঘণ্টা খানেকের পথ। গাড়ির মধ্যে বসে বিধুবাবু দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেলেন। এ যা বৃষ্টি সহজে থামবে না। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে চারদিকে জল দাঁড়িয়ে যেতে লাগলে।

অসহায় বিধুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। গাড়িটারই দোষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধুবাবু গাড়ির ওপর রাগ করলেন না। গাড়িটার বয়স হয়েছে, যন্ত্রপাতিরও অমিল, কী আর করা যাবে? তিনি স্টিয়ারিঙে নরম করে হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, তোমাকে কি ছাড়তে পারি?

কথাটা বলার কারণ আছে। তাঁর বন্ধুবান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা অনেকদিন ধরেই গাড়িটা বেচে দেওয়ার কথা বলছে। ইদানীং বিধুবাবুর স্ত্রীও খুব ধরেছেন গাড়িটা বেচে দেওয়ার জন্য। একজন বড়োলোক নাকি এটিকে ভিন্টেজ কার হিসেবে কিনতে চান। বেশ ভালো দাম দেবেন। এই নিয়ে বিধুবাবুর সঙ্গে তাঁর গিন্নির রোজই ঝগড়া হচ্ছে। বিধুবাবুর স্ত্রী গাড়িটা বিদায় করার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, হবু খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা অবধি নিয়ে ফেলেছেন। বিধুবাবুর আরও দু—খানা নতুন ঝকঝকে গাড়ি আছে। সুতরাং পুরোনো গাড়িটার যে আর দরকার নেই, এটাই বাড়ির লোকের অভিমত।

বিধুবাবু অচল গাড়ির মধ্যে বসে ভাবছেন, গাড়িটাকে কী করে হস্তান্তর থেকে বাঁচানো যায়। কোনো উপায় তাঁর মাথায় আসছে না। এই যে গাড়িটা খারাপ হল, এর ফলে আজ রাতে তিনি হয়তো বাড়িতে ফিরতে পারবেন না। তার ফলে পুরোনো গাড়ির বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিমত আরও জোরদার হবে। বিধুবাবু অন্ধকার গাড়ির মধ্যে বসে বিষণ্ণ মনে গাড়িটার ভবিতব্য নিয়েই ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, অন্ধকারে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। না, বিদ্যুতের আলো নয়। অনেকটা টর্চের আলোর মতো, তবে অনেক বেশি জোরালো। মনে হল আলোটা এল ওপর থেকে। বিধুবাবু একটু ভাবিত হলেন। নির্জন রাস্তা, জঙ্গল, বিপদ হতে কতক্ষণ?

এরপর বিধুবাবু টের পেলেন, তাঁর গাড়িটা একটা বেশ বড়ো রকমের ঝাঁকুনি খেল। ঠিক যেন, গাড়ির ছাদে একটা ভারী জিনিস এসে পড়ল। গাড়ির কাচ তোলা, বিধুবাবু কাচটা একটু নামিয়ে গলা তুলে বললেন,

কে রে? কে গাড়ির ছাদে?

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু একটু বাদেই গাড়ির ছাদ থেকে একটা কে যেন লাফ দিয়ে নেমে এল। বিধুবাবু গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যা দেখলেন তার চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আর কিছু হতে পারে না। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে একটা ডল পুতুল রাস্তায় দাঁড় করানো রয়েছে। প্রায় দুই ফুট উঁচু ফুটফুটে একটা মেয়ে—পুতুল। কিন্তু যেটা অবাক কাণ্ড সেটা হল, পুতুলটা তাঁর দিকে চেয়ে একটা হাত তুলে নাড়ছে। তাঁকে যেন কিছু বলতে চায়। তা বিদেশে কলের পুতুল অনেকদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। এটা সেরকমই একটা রিমোট কন্ট্রোল পুতুল কী? হলেই বা এই জঙ্গলে, বৃষ্টির মধ্যে এটা এল কোথা থেকে?

বিধুবাবু একটু ভয় খেলেন। ঘটনার পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই তো! থাকলেও তাঁর উপায় নেই। তিনি জানালার কাচটা নামালেন।

পুতুলটা তুমুল বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই বলল, তুমি চিন্তা করো না। চুপচাপ বসে থাকো।

বিধুবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি পুতুল?

হ্যাঁ, আমি কলের পুতুল।

আমার কথা বুঝতে পারছো কেমন করে? পুতুল কি কথা বুঝতে পারে?

আমরা অন্য জগতের পুতুল।

তার মানে?

আমরা যন্ত্রগ্রহের পুতুল।

বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।

পুতুলটা গুটগুট করে এগিয়ে এল। তারপর একটা লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, সব কথা কি তুমি বুঝবে?

বিধুবাবু সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, আমি বুঝবার চেষ্টা করব।

একান্ন আলো—বছর দূরে একটা গ্রহ আছে। সেখানে ঠিক আমাদের মতো দেখতে মানুষেরা বাস করে। তারাই আমাদের তৈরি করেছে। আমরা কলের পুতুল কিন্তু তারা সব মানুষ। মানুষগুলো একটু কুঁড়ে। আমাদের দিয়ে সব কাজ করায় আর নিজেরা কেবল বিশ্রাম করে, আর ফুর্তি করে।

বিধুবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, এখানে এলে কী করে?

বাঃ, আমাদের বুঝি গাড়ি নেই? আমরা তো প্রায়ই তোমাদের গ্রহে আসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো। আমাদের গ্রহের মানুষেরা খুব শৌখিন। সেখানকার শাকপাতা খেয়ে তারা খুশি নয়, নতুন নতুন জিনিস চায়। তাই আমরা ঘুরে ঘুরে তাদের জন্য শাকপাতা, ভালো মাছ, মাখন, মুরগি, ঘি, দুধ, মিষ্টি, চকোলেট নিয়ে যাই। শুধু তোমাদের গ্রহ নয়, অন্য সব গ্রহ থেকেও অনেক জিনিস আনি। কিন্তু সেগুলো কী জিনিস তা তুমি বুঝবে না।

বিধুবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে এলে কী করে?

ওই তো কাণ্ড। আমাদের গাড়িটা ওই জঙ্গলের মধ্যে খারাপ হয়ে গেল যে। তখনই আমরা তোমাকে দেখলাম। আমরা কলকবজা খুব ভালো জানি। গাড়িটা আমরা সারিয়ে ফেলেছি। এবার চলে যাব। তোমাকে দেখে একটু মায়া হল। ভাবলাম তোমার গাড়িটাও সারিয়ে দিয়ে যাই। আহা, কত পুরোনো আমলের গাড়ি!

তুমি বাংলা বলছো যে!

ওমা! বলব না? প্রায়ই আসি যে। শুনতে শুনতে শিখে গেছি। আমরা যে অন্য গ্রহের পুতুল তা তো কেউ বুঝতে পারে না। ধরা পড়ার ভাব দেখলেই আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।

বিধুবাবু একটা ঢোঁক গিলে বললেন, আমার গাড়ির ছাদে কী একটা রয়েছে বলো তো!

পুতুলটা হেসে বলল, আমাদের গাড়িটা। আমার বন্ধুরা তোমার গাড়িটা একটু দেখে নিচ্ছে। এখনই কাজ শুরু করবে।

বলতে বলতেই ঝুপ ঝুপ করে দশ—বারোটা ছেলে এবং মেয়ে পুতুল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। হাতে নানারকম যন্ত্রপাতি, তারা বনেট খুলে খেলে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, এ গাড়িটাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। কিন্তু তুমি তো জানো না, এ গাড়ি বেশিদিন রাখতে পারব না। সবাই বলছে বেচে দিতে।

পুতুলটা হাসল, তুমি যে গাড়িটাকে ভালোবাসো তা আমরা জানি। তোমার মনের ভাব আমাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। যারা যন্ত্রকে ভালোবাসে তাদের আমরাও ভালোবাসি। যন্ত্র নিষ্প্রাণ বটে, কিন্তু ভালোবাসা সেও ঠিক টের পায়, ভালোবাসার শক্তিই আলাদা কী বলো!

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভালোবাসা দিয়েও কি গাড়িটাকে বাঁচাতে পারব? তোমরা না হয় আজ সারিয়ে দিলে, দু—দিন পর আবার খারাপ হবে।

পুতুলটা মাথা নেড়ে বলল, আর খারাপ হবে না।

কোনোদিন না?

পুতুলটা হেসে বলল, খারাপ তো হবেই না, এমনকী এখন থেকে আর গাড়িতে পেট্রল নিতে হবে না, ব্যাটারি বদল করতে হবে না, চাকায় হাওয়া দিতে হবে না। লক্ষ লক্ষ মাইল চললেও না।

সত্যি?

সত্যিই। তোমার পুরোনো গাড়িতে আমরা আমাদের সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। গাড়িটা হাতছাড়া করো না কিন্তু।

হাতছাড়া করব না? কিন্তু আমি যখন থাকব না, তখন?

পুতুলটা হাসল, সেও আমরা টের পাব। পেয়ে, এসে আমাদের যন্ত্রগুলো খুলে নিয়ে যাব। গাড়ি আবার অচল হয়ে যাবে।

বিধুবাবু চোখ কচলে বললেন, এসব কি সত্যি বলছো? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?

পুতুলটা শুধু খিলখিল করে হাসল, তারপর কয়েক মিনিট বাদেই পুতুলরা ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে বনেট বন্ধ করে দিল। জানালার পুতুলটা বলল, চলি, এবার নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, আবার হয়তো দেখা হবে। নাও হতে পারে।

গাড়ির ছাদ থেকে হঠাৎ একটা ভারী বস্তু মচাৎ করে শব্দ তুলে চলে গেল। বিধুবাবু গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কী সুন্দর মোলায়েম শব্দে গাড়ি স্টার্ট নিল। হেডলাইট জ্বলল। গাড়ি চমৎকার ছুটতে লাগল।

না, বিধুবাবুকে আর গাড়িটা বেচতে হয়নি। বিনা তেলে, বিনা মেরামতিতে, বিনা হাওয়ায় গাড়িটা চলছে তো চলছেই।

ভগবানের আবির্ভাব

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত—পা ঠান্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্ট টিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দুটো পর্যায় থাকবে। কন্যাসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুঁকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে তা লোহিতাক্ষ জেনে গেছেন। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ—দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোনো সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড়কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা। আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড়কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড়কুড় কুড়কুড় শব্দ করছে। লোহিতাক্ষ যখন সর্দি—কাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ! চারবার নাক ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য অতএব দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজও তাঁর বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ।

এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

বাইরে দু—জন লোক এয়েছেন।

এই সকালে আবার কে এল?

তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।

ভালো লোক নয় কী করে বুঝলি?

আপনিও বুঝবেন। আমি শুদু কয়েছিনু যে, বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না, তাইতে প্রায় মারতে এল।

ওঃ তাই বুঝি খারাপ লোক। তা কী চায় তারা?

তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার, আপনি গিয়ে সামাল দিন।

লোহিতাক্ষ সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক!

লোহিতাক্ষর বাইরের ঘরে যে দু—জন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নীচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো গোলাকার। লম্বা লোকটি আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দু—জনের চোখই ভাঁটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, এরা চোখের ইশারায় মানুষের গলা

নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রং তামাটে উজ্জ্বল, মুখও ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব, বাঙালি, চীনে সবই হতে পারে।

কী চাই আপনাদের?

বেঁটে লোকটা তার ভাঁটার মতো চোখ দুটোকে আরও গনগনে করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন?

এ কথায় কার না রাগ হয়? নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তাঁর ক্ষেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও ক্ষেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, তার মানে? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছো তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, মেডেল! কীসের মেডেল?

ওই যে নোবেল প্রাইজ না কি যেন। তা সে যাকগে, তুমি যে ভালো ছেলে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ করলেন, বেঁটে লোকটার বাঁ কপালে একটা কালো রঙের জড়ুল। লোকটা মাঝে মাঝে জড়ুলটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

বেঁটে লোকটা একটু গা—জ্বালানো হাসি হেসে বলল, কেন, কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছে হে? অ্যাঁ!

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর বলল, আগেকার লোকেরা ভক্তিশ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা, ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জান না দেখছি।

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেঁটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষর মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, খেলনাটা দাও তো।

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, দেখলে তো! বিশ্বাস না হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আর লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ি রে বাবা।

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, কী হল হে মেডেল—পাওয়া কম্পাউন্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও। আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, ভগবানই হোন আর যাই হোন, আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা জ্বালিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমিই স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্তি—টুর্তি তোমরা পুজো করো তাদেরই একজন।

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তাঁর ভগবদ্ভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া করেন। তাঁর স্ত্রী মোটেই তাঁর নাস্তিকতাকে ভালো চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস—টিশ্বাস করি না। আর আপনাকেও আমার ভালো লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিসিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন, নমস্কার।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, বিশ্বাস করো না কি হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছো চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে।

আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরি কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে গেলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজুট, ধ্যান নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা—জ্বালানো হাসি হেসে বলল, দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু এটা ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্ধে পড়ে কিন্তু—কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দরমহল থেকে তাঁর স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। তোমার যে মহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাঁকে গালমন্দ করছো? ওরে বনমালী, শিগগির জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয়, ধূপ দীপ জ্বালা...

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নি বললেন, হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারীলক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বরটর চাইবে না?

বরের কথায় কর্তা—গিন্নি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, আরে লজ্জা কীসের? চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল, আমার আর বিশেষ সময় নেই।

গিন্নি ধরা গলায় বললেন, আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি...

তথাস্তু।

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি ...

তথাস্তু।

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছো, ওটা আর বানিও না, একটা দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে

বলেই মানুষ এখনো ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশার ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু...

আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাওগে। শুভস্য শীঘ্রম।

ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসছি। বলে গিন্নিই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই আমাদের আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এসব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজো আচ্চা করে এসেছো...

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?

তার আমি কী জানি, আমার বর ফলে কিনা তা আমি জানি না।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফরমুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ আবার বের করে ফেলব।

লোকটা মাথা নাড়ল, না, বের করবে না। বের করলে কী হবে জানো?

কী হবে?

তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পারো না সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেবো।

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এতবড়ো বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ছেলের মতো একটা স্বভাব আছে তাঁর। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর যা অবস্থা দেখছেন ধানুরাম তাতে তাঁর ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। ধানুরাম কবিরাজ। এই তেত্রিশশো বাহান্ন সালে আয়ুর্বেদের তেমন কদর হওয়ার কথা ছিল না। বাপ—পিতেমোর পেশা ছেড়েই দিতে চেয়েছিলেন, আর কবরেজি করবেনই বা কী ভাবে?

সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল শহর আর বসত। গাছগাছালির পাঠ উঠে গিয়েছিল। ধানুরাম তখন কবরেজি ছেড়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই একটা রাসায়নিক গবেষণাগারে কাজ করতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে।

একদিন সহকর্মী বনমালী বলল, ধানু গোপনে তোমাকে একটা খবর দিই। আমি একটা জিনিস বানিয়েছি, বড়ো আজব জিনিস।

কী বল তো!

মাধ্যাকর্ষণকে ফাঁকি দেওয়ার একটা কায়দা করা গেছে। একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে নানারকম জিনিস মিশিয়ে যাচ্ছিলাম খেয়ালখুশিতে, হঠাৎ দ্রব্যটা লাফিয়ে শূন্যে উঠে ভাসতে লাগল।

বলো কী হে?

তবে আর বলছি কী?

বনমালীর সেই আবিষ্কার থেকে দেখ—না—দেখ দুনিয়ার ভোল পালটে গেল। তার কারণ ওই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষজন তাই শূন্যপথে যাতায়াত করতে শুরু করল। মাটির ওপর দিয়ে যাতায়াত কমে যেতে লাগল। তার ফলে রাস্তাঘাট ফাঁকা পড়ে থেকে থেকে গাছপালা গজাতে লাগল। তারও ওপর বনমালীর ওই জিনিস আরও উন্নত করে মহাশূন্যে যাতায়াত হয়ে গেল আরও সহজ এবং দ্রুত। ফলে সূর্যের অন্য সব গ্রহে যাতায়াতে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আর রইল না। আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যে অন্যান্য গ্রহে এবং চাঁদে বিরাট বিরাট কলোনী তো হলই, আকাশে বেলুন বাড়ি তৈরি হল মেলা। পৃথিবীর দু—চার মাইল ওপরে শূন্যে বাড়িগুলো ভেসে থাকে। ফলে পৃথিবীতে বাস না করে অধিকাংশ মানুষই ভালো আবহাওয়ার জন্য আর নির্জনতার খোঁজে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে শহর ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল এবং সেখানে গাছপালা গজাতে লাগল।

এখন সেই আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবী গাছপালায় ছেয়ে তো গেছেই, জঙ্গল এত নিবিড় হয়েছে যে পা রাখার জায়গা নেই। সাপ, বাঘ, সিংহ, ভালুক, গরিলা, ব্যাঙ, বিছে একেবারে গিজগিজ করছে। দিনেদুপুরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

মুশকিলটা এখানেই। জঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে গাছগাছড়ার খোঁজ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকালে ধানুরাম তার ভাসমান নৌকার মতো বাতাসী যানে নাতি সহ কণ্টিকারি, পাথরকুঁচি, বিশল্যকরণী ইত্যাদি গাছগাছড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথাও নামতে সাহস হচ্ছে না। এক জায়গায় ঘন জঙ্গল দেখে নামতে গিয়ে দেখলেন তলায় সাত আটটা বাঘ মুখ তুলে তাদের দেখছে।

নাতি বলল, বাঃ, কী সুন্দর!

ধানুরাম ভ্রূ কুঁচকে বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আগে পৃথিবীতে একটাও বাঘ ছিল না। কোথা থেকে যে গজাল কে জানে!

নাতি অবশ্য মজাই পাচ্ছে। কারণ সে থাকে তার বাবার কাছে, পৃথিবীর দু—মাইল ওপরে এক আকাশবাড়িতে। বাঘ দূরের কথা গাছপালাও চোখে দেখেনি। সে বলল নামো না দাদু।

বাপ রে! নামলেই ঘ্যাঁক।

তার মানে?

সে বুঝবি না। ও হল, বাঘ।

বাঘ তো কী?

ও বড়ো ভয়ংকর জিনিস।

আবার আর এক জায়গায় নামতে গিয়ে ধানুরাম দেখলেন একটা গরিলা মস্ত একটা গাছের গায়ে গা ঘষে পিঠ চুলকোচ্ছে।

দাদু, আমি ওই লোকটার সঙ্গে ভাব করব।

ভাব করার লোক নয় দাদু, কাছে গেলেই ঘাড় মটকাবে।

নাতি ঝুঁকে জঙ্গলের মধ্যে গরিলাটাকে দেখছিল। দুষ্টু ছেলে, হঠাৎ নৌকোর কানা টপকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। ধানুরাম তাকে সাবধান করার সময়টাও পেলেন না। অসহায়ভাবে চেঁচাতে লাগলেন, ও দাদু! ও দাদু! এ কী সব্বনেশে কাণ্ড করলি!

নীচে লাফ দিলেও হাত পা অবশ্য ভাঙবে না। কারণ নাতির জুতোয় বনমালীর সেই আবিষ্কার লাগানো আছে। নাতি ধীর গতিতেই পড়ল এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধানুরাম ভয়ে উদবেগে ঘামতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অগত্যা নিজের যানটিকে নীচে নামিয়ে আনলেন। নামাতে খুবই ক্লেশ পেতে হল। নিশ্ছিদ্র গাছপালা, লতাগুল্মে তলাটা দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। যানটা ভূমিস্পর্শ করতে পারল না। লতাপাতায় আটকে ঝুলে রইল। ধানুরাম লাফ দিয়ে নীচে নেমে নাতির নাম ধরে ডাকাডাকি করে খুঁজতে লাগলেন। চারিদিকে নানারকম জীবজন্তুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। একটা হাতি ডেকে উঠল কাছেপিঠে। হায়না হাসল। ধানুরামের বুক কাঁপতে লাগল ভয়ে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সী নাতি। এ জঙ্গলে তার নিরাপত্তা কোথায়?

খুঁজতে খুঁজতেই ধানুরাম বুঝতে পারলেন আশা নেই। গাছপালায় চারদিক এত অন্ধকার যে এই দিন দুপুরেও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন। যদি সাড়া দেয়। তারপরেই ঘটল অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ধানুরাম নাতিকে খুঁজতে খুঁজতে বেশ খানিকটা এগোতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই গরিলাটা তার নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফাঁকা জায়গায়। আর সাতটা বাঘ তার নাতিকে ঘিরে পা আর গা চেটে আদর করছে।

ধানুরাম একটা শ্বাস ছাড়লেন। না, জীবজন্তুরা আর আগের মতো নেই। নব্য প্রজন্মের এরা বেশ সভ্য ভব্যই বলতে হবে।
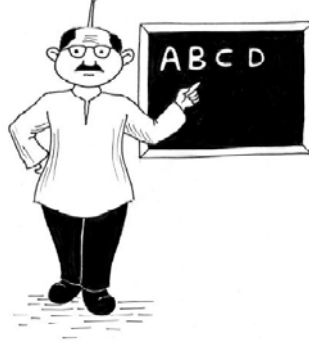
ভুসুক পণ্ডিত

ভুসুক পণ্ডিত ভারী অলস। পাঠশালায় পড়াতে পড়াতে ছেলেদের টাসক করতে গিয়ে প্রায় সময়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আর ছেলেরা সেই সুযোগে দেদার ফাঁকি দেয়।

সময়টা ২০৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। ভুসুক পণ্ডিত ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিলেন বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ? তারপর ঘুমোতে লাগলেন।

পাঠশালা বসে একটা প্রকাণ্ড শিমুলগাছের তলায়। নিয়ম হয়েছে সেই আগেকার দিনের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই এই ব্যবস্থা। ভুসুক পণ্ডিত বসেন গাছতলায় উঁচু একটা বেদিতে। ছেলেরা বসে ঘাসের ওপর মাদুর পেতে।

ভুসুক পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা নিজেদের কাজ শুরু করে দিল। একটি ছেলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা লেসার রশ্মির পিস্তল বের করে টুকটাক ফল পাড়তে লাগল। একজন পকেট কম্পিউটারের সঙ্গে খেলতে বসে দাবা। জনা তিনেক একটা হাতঘড়ির সাইজের টেলিভিশনে চুপিচুপি অ্যাডভেঞ্চারের ফিলম দেখতে লাগল। একজন অ্যান্টিগ্র্যাভিটি সাইকেলে উঠে আকাশে চক্কর দিতে থাকল। একজন দুষ্টু ছেলে আর একজনকে ডেকে বলল, অ্যাই, আজ চল পণ্ডিত মশায়ের টিকি কেটে দিই।

দ্বিতীয় ছেলেটা চোখ গোল করে বলে ওঠে, ওরে বাবা! টের পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

কথাটা ঠিক। ভুসুক পণ্ডিতের চেহারাটা এমনিতে নাদুসনুদুস। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, কাঁধের ওপর একটা ভাঁজ করা উড়ুনি। পৈতেটা ধপধপ করছে সাদা। নিষ্ঠাবান মানুষ। চেহারাটা নিরীহ হলে কী, ভুসুক পণ্ডিত সাঙ্ঘাতিক রাগী লোক।

দুষ্টু ছেলেটা বলল, টের পেলে তো!

দ্বিতীয় জন ভয়ে ভয়ে বলে, পারবি?

খুব পারব। এই বলে ছেলেটা পকেট থেকে একটা খুদে ওয়াকিটকি বের করে অন্য সব ছেলেদের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, আজ ভুসুক পণ্ডিত মশায়ের শিখা কর্তন করা হইবে। তোমরা কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না যে, অপকর্মটি কে করিয়াছে। কেহ যদি প্রকাশ কর তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।'

অন্য সব ছেলেরা তাদের গলার কাছে বাঁধা ট্রান্সরিসিভার যন্ত্রে ঘোষণাটা শুনতে পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না।

দুষ্টু ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে একটা সোনার রেঞ্জ বের করল। যন্ত্রটা দিয়ে ইচ্ছে মতো নানারকম শব্দ বের করা যায়, মাইক্রোফিলমের মতো এর ভিতরে আছে একটি প্রি—রেকর্ডেভ মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার। ছেলেটা একটা বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করল। তারপর একটা পিস্তলের নলের মতো ব্যারেল লাগিয়ে সেটা তাক করল ভুসুক পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে।

ব্যাপারটা হল, এই শব্দটা আসলে ঘুমপাড়ানি শব্দ। যার দিকে তাক করে শব্দটা নিক্ষেপ করা হবে সে ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পাবে না। অবশ্য কানে শোনার শব্দও এটা নয়। এটা হল এক ধরনের কাঁপন বা ভাইব্রেশন, যা আধ মিনিটের মধ্যে যে—কোনো লোককে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

দুষ্টু ছেলেটা পুরো এক মিনিট শব্দটা চালাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠল। প্রত্যেকে দুরুদুরু বুকে চেয়ে আছে দুঃসাহসী ছেলেটার দিকে। যন্ত্রের প্রভাবে পণ্ডিতমশাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছেন বটে, কিন্তু এক সময়ে তো জাগবেন! তখন যে কী কুরুক্ষেত্রটাই হবে। ছেলেটা পকেট থেকে ধারালো কাঁচি বের করে পণ্ডিত মশাইয়ের পেছনে গিয়ে কুচ করে টিকিটা কেটে এক দৌড়ে পালিয়ে এল নিজের জায়গায়। পাঠশালায় এক চাপা হাসির হররা বয়ে গেল।

সেই শব্দেই কিনা কে জানে, আচমকা পণ্ডিতমশাই চোখ মেলে চাইলেন।

ছেলেরা তো ভয়ে কাঠ। শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সব। একটু অবাকও হয়েছে তারা। ভাইব্রেটার দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে পণ্ডিতমশাইকে, এত সহজে তো তাঁর জাগবার কথা নয়।

ভুসুক পণ্ডিতমশাই চোখ চেয়েই বিশাল একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন হঠাৎ। ছেলেরা স্তম্ভিত। তারা কখনো পণ্ডিমশাইকে হাসতে দেখেনি।

কিন্তু তাদের আরও স্তম্ভিত করে দিল, পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আজ তোমাদের ছুটি! ছুটি!

ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল, ছুটি পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, কীসের লেখাপড়া হ্যাঁ! অ্যাঁ! লেখাপড়া অত কীসের? বাচ্চচা ছেলেরা নাচবে, গাইবে, দুষ্টুমি করবে, তবে না! ওঠো সব, উঠে পড়ো! আজ আমাদের গান হবে। নাচ হবে। হুল্লোড় হবে।

বলেন কি পণ্ডিতমশাই? ছেলেদের চোখের ভাব ক্রমশ আরও গোল হয়ে উঠছে।

ভুসুক পণ্ডিত হঠাৎ নিজেই তড়াক করে বেদি থেকে নেমে পড়লেন। তারপর দু—হাত তুলে গান ধরলেন, আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি...গাও! গাও!

ছেলেরাও গাইতে লাগল।

ভুসুক পণ্ডিত নাচতে নাচতে বললেন, শুধু গাইলেই হবে না, নাচো! সবাই নাচতে শুরু করো।

তা ছেলেদের তো পোয়া বারো। রচনা ছেড়ে নাচ—গান! এ কি ভাবা যায়! তারা সবাই পণ্ডিমশাইয়ের সঙ্গে নাচতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ নাচ—গান হওয়ার পর ভুসুক পণ্ডিতমশাই বললেন, শুধু নাচ—গান নয়। চলো সবাই মিলে একটু দুষ্টুমি করা যাক। চলো সনাতন মুৎসুদ্দির বাগান থেকে পেয়ারা চুরি করি।

ছেলেরা নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, বলেন কী পণ্ডিতমশাই?

কিন্তু ভুসুক পণ্ডিতের যেই কথা সেই কাজ। তিনি সবার আগে গিয়ে সনাতনের বাগানের বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়াটিকে এক জায়গায় কেটে ফাঁক করে ঢোকার রাস্তা বানালেন। তারপর বাগানে ঢুকে নিজেই ঢিল মেরে এবং একটি ছেলের কাছ থেকে লেসার গান চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মেলা পেয়ারা পেড়ে ফেললেন। সনাতনের রোবট চাকরগুলো তেড়ে আসায় পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর বললেন, চলো, একটু ফুটবল খেলা যাক।

ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। পড়াশুনা ছেড়ে এরকম মজার সময় কাটানো মহাভাগ্যের ব্যাপার। পণ্ডিতমশাই নিজে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে নেমে পড়লেন। বিস্তর আছাড় খেলেন বটে, কিন্তু

খেললেনও চমৎকার। দুটো দারুণ গোল করলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের এত বিদ্যের কথা কেউ জানত না।

খেলার শেষে পণ্ডিতমশাই বললেন, ওহে, চল পুকুরে স্নান করতে নামি।

ছেলেরা এই প্রস্তাবে হইহই করে উঠল। কাছে চমৎকার বাঁধানো পুকুর। পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তুমুল আনন্দে সবাই স্নান করতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই তাদের আনন্দের মধ্যে একটা বজ্র এসে পড়ল যেন। আকাশ থেকে একটা ছোট্ট নৌকোর সাইজের রকেট নেমে এল। তা থেকে গম্ভীর চেহারার একজন লোক নেমে এসে ভুসুক পণ্ডিতমশাইকে একটা ধমক দিয়ে বলল, শিগগির উঠে আসুন।

ভুসুক পণ্ডিত যেন একটু ভয় পেয়ে জল থেকে উঠলেন। সঙ্গে ছেলেরা।

লোকটা ভুসুক পণ্ডিতমশাইকে ভালো করে লক্ষ করল, ঘুরে ফিরে দেখল, তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, এর অ্যানটেনাটা কে কেটেছে?

ছেলেরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।

লোকটা বলল, দুষ্টু ছেলে! ছিঃ।

এই বলে সকলের চোখের সামনে লোকটা একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মাথার খুলিটা ফাঁক করে ফেলল, তারপর একটা নতুন টিকি বসিয়ে দিয়ে মাথাটা আবার জুড়ে বলল, 'এঃ, এই কম্পিউটারের একটা পারটস খারাপ ছিল? কেউ লক্ষই করিনি, টিকিটা কাটায় ভালোই হয়েছে। যাও, এবার আর পণ্ডিতমশাই ঘুমোবেন না।'

টিকিটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ভুসুক পণ্ডিতমশাই আবার গম্ভীর ও রাগী হয়ে গেলেন। গাছতলায় পাঠশালায় ছেলেদের জড়ো করে গমগমে গলায় বললেন, এবার আঁকের খাতা খোলো সব। করো, একসারসাইজ ষোলোর এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত আঁকাগুলো।

ছেলেরা প্রাণভয়ে আঁক কষতে লাগল। কারণ ভুসুক পণ্ডিতের চোখে ঘুমের লেশমাত্র আর নেই। দুই চোখ ভাঁটার মতো চারদিকে ঘুরছে।

ভৌত চশমা

বিকেলের দিকে বৈজ্ঞানিক গয়েশ সামন্তর মাথা ধরেছিল। মাথা ধরার আর দোষ কী? সারাদিন তিনি তাপহীন আগুন নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখনও জিনিসটা তাঁর ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে হবে, পৃথিবীতে— শুধু পৃথিবীতেই বা কেন— সারা বিশ্বজগতে একটা বিশাল বিপ্লব ঘটে যাবে তাহলে। অবশ্য তাপহীন আগুনে রান্না করা যাবে কিনা তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে আলো জ্বলবে। যেমন জোনাকি পোকার আলো, যেমন বেড়ালের বা গোরুর চোখের আলো, যেমন কিনা হাতঘড়ির ডায়ালের আলো। বৈজ্ঞানিক গয়েশ সেই সব আলো দেখেই তাপহীন আগুন আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছেন। আবিষ্কৃত হলে সেই আগুনে অনেক কাণ্ড হবে। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাড়ি পুড়বে না, সেই আগুন হাতে বা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যাবে, তখন আগুন নিয়ে বাচ্চচারাও খেলা করতে পারবে।

সাফল্যের খুব কাছাকাছি এসে গয়েশ খুবই উত্তেজিত। দীর্ঘদিন একটানা সাধনা করার পর খুব ক্লান্তও। তাই বিকেলের দিকে মাথা ধরা ছাড়ানোর জন্য তিনি গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এলেন একটু পায়চারি করার জন্য।

কিন্তু পৃথিবীটা বড়ো নোংরা। চারদিকে ধুলো, আবর্জনা, বদ গন্ধ, গণ্ডগোল, নাক কুঁচকে, চোখ বুজে, কানে আঙুল দিলেন তিনি। তারপর সোজা ছাদের গ্যারেজ ঘরে গিয়ে একটা মাঝারি রকেট বেছে নিয়ে তাতে উঠে বসলেন।

সোঁ করে চলে এলেন চাঁদে। এ জায়গাটায় এখনও তেমন ভিড়ভাট্টা নেই। বাতাসের অভাবে ধুলো—টুলো ওড়ে না, কোনো গন্ধও আসে না নাকে। তবে এখানেও হরেক রকম গবেষণাগার হয়েছে, বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, কৃত্রিম উপায়ে বাতাস, মাধ্যাকর্ষণ ও আবহমণ্ডল তৈরির চেষ্টা চলছে। লজ্জার কথা, চাষবাসের জন্যও নাকি তোড়জোড় হচ্ছে। এমনকী বৈজ্ঞানিকরা চাঁদের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জমাট বরফ গলিয়ে নদী তৈরির চেষ্টাও করছেন। ফলে চাঁদের বিশুদ্ধতাও আর বেশিদিন থাকবে না।

মহাকাশচারীর পোশাকে গয়েশ সামন্ত তাঁর রকেট থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের নির্জন এক মস্ত পাহাড়ের তলায় পায়চারি করতে লাগলেন। তাপহীন আগুনের চিন্তায় তাঁর মাথা গরম।

পায়চারি করছেন, এমন সময় সামনে টুক করে একটা ঢিল পড়ল। পৃথিবীতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। দুষ্টু ছেলের অভাব নেই সেখানে। কিন্তু চাঁদের এই নির্জন পাহাড়তলিতে ঢিল মারে কে! গয়েশ অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকেন। হঠাৎ নজরে পড়ল মাটি থেকে হাত বিশেক ওপরে একটা গামলার মতো বিচ্ছিরি চেহারার শূন্যযান থেকে বৈজ্ঞানিক হারাধন খাঁড়া উঁকি মেরে তাঁকে দেখছে এবং ফিক করে হাসছে। হারাধনকে দু—চোখে দেখতে পারেন না গয়েশ।

হারাধন জলগ্রহ নেপচুনে হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বানিয়ে সেখান থেকে প্রজেকটারের সাহায্যে পৃথিবীতে অঢেল বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। খুব রবরবা তাঁর।

গয়েশ বিরক্ত হলেও ভদ্রতার খাতিরে হারাধনের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

হারাধন তার গামলাটা নামিয়ে আনল। মহাকাশচারীর বর্মের মতো পোশাক পরা অবস্থাতেও হারাধন তার ঘাড় চুলকোবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে গামলা থেকে মাটিতে নেমে এসে স্পিকিং টিউবের ভিতর দিয়ে বলল— কখন থেকে পোশাকের মধ্যে একটা ছারপোকা ঢুকে রয়েছে, জ্বালিয়ে খেলে।

গয়েশ তার কথা বলার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বললেন— স্পেশসুটে আজকাল বড্ড ছারপোকা হচ্ছে। আমাকেও প্রায়ই কামড়ায়। একজন মার্কিন সায়েন্টিস্ট সেদিন দুঃখ করে বলছিলেন তাঁর একটা শখের স্পেশসুট নাকি উই পোকায় খেয়ে ফুটো করেছে, আর একটায় কাঁকড়াবিছে বাসা বেঁধেছে, বোঝো কাণ্ড!

হারাধন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে— শুধু তাই নয়, পোকাগুলোকে কিছুতেই মারাও যাচ্ছে না। সবচেয়ে কড়া পোকা মারার ওষুধ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। ভারি মুশকিল।

পোকামাকড়ের কথা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে আলোচনা করলেন দু—জনে। তারপর হারাধন বলল— আজ বড়ো খাটুনি গেল গয়েশদা। নেপচুনে যন্ত্রপাতির কিছু গণ্ডগোল ছিল। সেই রাত বারোটা থেকে সারাদিন, এখনও হাতমুখ ধোয়ার সময় পাইনি।

গয়েশ আঁতকে উঠে বললেন— হাতমুখ কি চাঁদের জল দিয়ে ধোবে নাকি? সর্বনাশ, এখানকার জল কিন্তু ভীষণ ভারী, বিচ্ছিরি সব মিনারেল রয়েছে এই জলে।

হারাধন হেসে বলে— আরে না, আমি প্লুটো থেকে হাতমুখ ধোয়ার বা স্নান করার জল আনি।

গয়েশ উদবিগ্ন হয়ে বলেন— খাও কোন জল?

—নেপচুন, ও ছাড়া অন্য জল সহ্যই হয় না। আমাশা হয়ে যায়।

গয়েশ ম্লান মুখে বলেন— আমারই। নেপচুনের জলে শুনেছি অনেক ট্রেস এলিমেন্ট আছে। আমার জন্য খানিকটা পাঠিয়ে দিও তো। পেটটা কয়েকদিন ধরেই বড়ো ভুটভাট করছে।

হারাধন ম্লান মুখে বলে, ভুটভাটের কথা আর বোলো না দাদা। আমিও ওই ভুটভাটের রুগি। তাঁরা কিছুক্ষণ পেটের গোলমাল আর জলবায়ু নিয়ে কথা বললেন।

হারাধন হঠাৎ বললেন— আরে ভালো কথা, ইঞ্জিনিয়ারদের সব মাইনে বাড়ল শুনেছো নাকি!

বিরস মুখে গয়েশ বলেন— শুনছি তো তাই।

—তো আমাদের সায়েন্টিস্টদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা হল না তাহলে এবারও?

—কই আর হল!

—এ ভারি অন্যায় গয়েশদা। তোমাকে এই বলে রাখছি, সরকার যদি সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে সৎমার মতো ব্যবহার করে তবে কিন্তু তারা ধর্মঘট করতে বাধ্য হবে। এবার স্পেশ সায়েন্সের জন্য নোবেল প্রাইজ কাকে দিয়েছে জানো?

—না, গয়েশ খুব সতর্ক গলায় বলেন। আসলে তিনি শুনেছেন, ডিসেম্বর মাসের আগে যদি তিনি তাপহীন আগুন আবিষ্কার করতে পারেন তবে নোবেল প্রাইজ তাঁকেই দেওয়া হবে। মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্য তাপহীন আগুনের বড়োই দরকার।

এবার তাঁরা কিছুক্ষণ বেতন বৃদ্ধি এবং প্রাইজ নিয়ে কথাবার্তা চালালেন। তারপর হারাধন তাঁর গামলার মতো শূন্যযানে চড়ে চলে গেলেন হাত—পা ধুয়ে বিশ্রাম নিতে।

চাঁদ থেকে আকাশের রং ঘোর কালো দেখায়। গয়েশ অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। নিকশ কালো আকাশে প্রচণ্ড তেজে সূর্য জ্বলছে। আগুনকে তাপহীন করার পদ্ধতি যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে একদিন সূর্যের তাপকেও নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে না। ভ্রূ কুঁচকে এইসব ভাবতে ভাবতে আর অবিরল পায়চারি করতে করতে তাঁর একটু খিদে পেল।

গয়েশের রকেটটা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রকেটের গায়ে চৌম্বক খিল দিয়ে একটা চমৎকার হালকা কাচতন্তুর শূন্যযান লাগানো। দেখতে অনেকটা পিরিচের মতো। গয়েশ পিরিচটা খুলে উঠে বসলেন। চোখের পলকে চাঁদের গবেষণাগারের কাছে লোকবসতির মধ্যে এসে নামলেন। ঢুকলেন মাটির তলার ক্যান্টিনে।

এখানে কৃত্রিম আবহমণ্ডল থাকায় স্পেশসুট খুলে ফেললেন গয়েশ। জল ছুঁলেন না, একটা রশ্মিযন্ত্রের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে নানারকম রশ্মি দিয়ে হাত—মুখ বীজাণুমুক্ত করলেন। তারপর মস্ত হলঘরে গিয়ে বসলেন। হলঘর একেবারে ফাঁকা। তবে প্রায় সিকি মাইল লম্বা হলের একেবারে শেষ প্রান্তে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা বসে আপনমনে বিড়বিড় করছেন। ব্যর্থ ও উন্মাদ বৈজ্ঞানিকদের যে তালিকাটি গতবছর বেরিয়েছে তাতে সাধনের নাম সবার ওপরে। লোকটা খুব সাংঘাতিক কিছু আবিষ্কার করার জন্য খুব গোপনে গবেষণা চালাচ্ছিল। আর সেই গবেষণা করতে করতেই কেমন যেন পাগলাটে আর একাচোরা স্বভাবের হয়ে গেল। পৃথিবীতে নিজের বাড়িতে আর যায় না। চাঁদের ক্যান্টিনেই সারাদিন বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। তাকে কেউ ঘাঁটায় না।

গয়েশ বসতেই বেশ স্মার্ট চেহারার একটা রোবট বেয়ারা এসে টেবিলটা একটা ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে পরিষ্কার করে দিয়ে বলল— কী খাবেন?

গয়েশ বিস্বাদ মুখে ভাবতে লাগলেন। খিদে পেলেও তাঁর মুখে রুচি নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, আবার সব কিছু পেটে সহ্যও হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন— মুড়ি আর ছাগলের দুধ।

রোবট চলে গেল। একা মস্ত হলঘরটায় বসে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন গয়েশ। বড্ড ফাঁকা আর একা লাগছে। ওদিকে বহু দূরে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা আপনমনে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। এক একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখছেন গয়েশ।

হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই সাধন হাজরা হাতছানি দিয়ে ডাকল গয়েশকে। একটু দোনোমোনো করে গয়েশ উঠলেন। ভাবলেন পাগল হোক ক্ষ্যাপা হোক একজন সঙ্গী তো বটে।

কাছে গিয়ে বসতেই সাধন গয়েশের কানে কানে বলল— কাল অবশেষে জিনিসটা আবিষ্কার করেছি।

গয়েশ বললেন— কী?

—একটা চশমা। এটার নাম হল ভৌত চশমা। বলে সাধন পকেট থেকে একটা চশমার খাপ বের করে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখে। গয়েশ দেখলেন, চশমাটায় নানারকম ক্ষুদে যন্ত্রপাতি লাগানো। কাচটা গাঢ় কালো। সাধন ফিস ফিস করে বলল, দেখবে?

গয়েশ অবাক হয়ে বলেন— কী?

সাধন বলে— বহুদিন ধরেই টের পাচ্ছি যে তেনারা আছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যত সব বৈজ্ঞানিকদের পাল্লায় পড়ে কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইত না। তখনই ঠিক করেছিলুম, যেমন করে হোক একটা এমন যন্তর বের করতে হবে যা দিয়ে তেনাদের চাক্ষুষ দেখা যায়। তখন তো আর অবিশ্বাস করতে পারবে না! এতদিনে বের করেছি। দেখবে!

গয়েশ ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই হঠাৎ সাধন চশমাটা তুলে খপ করে পরিয়ে দেয় গয়েশকে। চশমাটাও এমন ব্যাদড়া যে চোখে বসে যেন আঠা হয়ে লেগে গেল।

প্রথমটায় গয়েশ কিছুই দেখতে পেলেন না অন্ধকার ছাড়া। তারপর দেখেন তাঁর চারধারে হলঘরটা যেন একটা কালচে আলোয় ভরে উঠল। কিংবা ঠিক আলোও নয়, অনেকটা এক্স—রে—র মতো যেন দেখা যাচ্ছে সব কিছু। দেখতে দেখতে হঠাৎ ভীষণ আঁতকে ওঠেন গয়েশ। এ কী? ফাঁকা হলঘরটা যে লোকে ভরতি। শুধু ভরতি নয়, একেবারে গিজগিজ করছে ঠাসাঠাসি সব মানুষ! শুধু মেঝেতে নয়, শূন্যে একেবারে সিলিং পর্যন্ত একের ঘাড়ে আর একজন চেপে বসে আছে। তারা ভাসছে ঘুরছে, হাঁটছে, হাসছে, হাঁচছে, কথা কইছে, দেয়াল ফুঁড়ে খুশিমতো বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢুকছে।

গয়েশ চেঁচিয়ে উঠলেন— এ কী! এরা কারা?

কানের কাছে সাধন ফিস ফিস করে বলল— তেনারা। এখন বিশ্বাস হল তো! বড়ো যে ভূতে বিশ্বাস করতে না?

—ভূ—? বলে কোনোক্রমে অজ্ঞান হতে হতে নিজেকে সামলে নিলেন গয়েশ। চশমাটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন হলঘরের দরজার দিকে। কোনোক্রমে স্পেশসুটটা পরে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাইরে। পিরিচে উঠে বিদ্যুৎবেগে চালিয়ে দিলেন সেটা রকেটের দিকে। আর সারাক্ষণ বড়ো বড়ো চোখ চেয়ে বিহ্বল গলায় বলতে লাগলেন— ভূ ... ভূ... ভূ...ভূ...

লোকটা

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলায় বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান। সেখানে খেলা করছে তাঁর সাতটা ভয়ংকর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালি দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদাসতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু এরকম সুরক্ষিত থাকতেই ভালোবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হিরে—জহরত, সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হল। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমতো টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। পাথরকুচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুরেরাও যেমন খেলছিল তেমনিই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভালোমানুষিও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেইরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনো দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, 'কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?'

লোকটা জবাবে পালটা একটা প্রশ্ন করল, 'আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?'

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, 'না তো— ইয়ে— মানে আপনি কে বলুন তো?'

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'আমার খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।'

লোকটার বাঁ কবজিতে একটা অদ্ভুতদর্শন ঘড়ি। বেশ বড়ো এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোটো ছোটো ডায়াল ও কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। তার ওপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন— এটাই বা কেমন কথা?'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?'

'আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।'

'আমিও খিদে পেলে খাই।' এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।'

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বলল, 'আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।'

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললেন, 'আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কী করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনো লোক কখনো খবর না দিয়ে ঢুকতে পারে না।'

লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, 'সে কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুরেরা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু—চারটে কথা বলা যেত।'

এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই, আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।'

সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।

সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, 'এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কী। ওই যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টুমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।'

সোমনাথবাবু এত বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখন গলায় ভালো করে স্বর ফুটছে না, 'আপনি ওদের কথা বুঝতে পারে? ভাবই বা হল কী করে?'

লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, 'আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু—পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললেন নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?'

সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হল যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, 'কিন্তু ভাব করলেন কী করে?'

'ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে!'

সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতোই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানী লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।'

লোকটি মিটিমিটি হেসে বলে, 'আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।'

সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'মানে— ইয়ে— যাকগে, আমার এখন আর কোনো বিরূপ ভাব নেই।'

'আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।'

শশব্যস্তে সোমনাথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।'

লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চচড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'আর সময় নেই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।'

সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।'

'গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।'

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, 'এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস! ফস করে ঢুকতে দিলি যে বড়ো!'

বাহাদুর তার ছোটো চোখ দুটো যথাসম্ভব বড়ো বড়ো করে বলল, 'কেউ তো আসেনি বাবু।'

'আলবাৎ এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।'

বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, 'না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।'

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুকলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হল নাকি?'

সোমনাথবাবু তাঁর কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, 'নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টুঁ শব্দটিও করলি না!'

কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তাঁর সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজি হয়ে উঠতে লেগেছে।

একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুরেরাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'এই যে! কী খবর?'

'আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?'

'তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান ভুল দেখে, কুকুরেরাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকছে না।'

লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, 'আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।'

সোমনাথবাবু এ কথা শুনে একেবারে বুরবক, 'তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?'

লোকটি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, 'না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু—লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও আছে।'

উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, 'কোথায় মিল মশাই? কীসের মিল?'

লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড়ো খিদে পেয়েছে।'

সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খিদে পেয়েছে তো হোটেলে গেলেই হয়।'

লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই যে!'

'পয়সা নেই! এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?'

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, 'এ জিনিস এখানে চলবে?'

'তার মানে?'

'আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শো টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন!'

সোমনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হল? এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।'

লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, 'সব কথারই জবাব দেবো। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।'

সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?'

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ!'

সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'শুধু খ! এরকম নাম হয় নাকি?'

'আমাদের ওখানে হয়।'

'আর পদবি?'

'খ মানেই নাম আর পদবি। খ হল নাম আর অ হল পদবি। দুয়ে মিলেই ওই খ।'

'ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।'

'আমাদের সবই ওরকম।'

'তা আপনার বাড়ি কোথায়?'

'একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।'

'আল! আল আবার কী জিনিস?'

'ওটা হল দূরত্বের মাপ।'

'এরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইলখানেক হবে নাকি?'

লোকটা হাসল, 'একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।'

'না না, থাক।'

লোকটা অভিমানী মুখে বলে, 'আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভালো লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনো বদ মতলব নেই।'

সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আরে না না। ঠিক আছে, বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এ সময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।'

'তাই হবে, চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।'

'মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।'

'আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।'

কৌতূহলী সোমনাথাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।

'কোথায় আপনার গাড়ি মশাই?' বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, 'আহা, যাবেন না, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।'

বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড়ো জিনিস, একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নীচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।

'এটা আবার কী জিনিস?'

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি। লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক।'

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, 'ভূ—ভূত! ভূ—ভূতুড়ে! ....'

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'না মশাই না। ভূতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনো ভয় নেই।'

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাব না।'

লোকটা করুণ মুখে বলে, 'কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।'

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, 'খারাপ নন, তবে ভয়ংকর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।'

'আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু—হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড়ো গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার চারদিকে দেড় হাজার ছোটো—বড়ো গ্রহ আছে। সব ক—টা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনো কোনো গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে, কোনোটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ, কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনো গ্রহে ঘোর কলি, কোনোটাতে সত্য, কোনোটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর— সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।'

'ওরে বাবা রে!' বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাঁকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হল। যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, 'আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।'

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডায়নোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথ। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। দু—চারটে তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভালো। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দু—জনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথাবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে জঙ্গলে

ঢুকে পড়লেন।

সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, 'এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?'

'সব সত্যি। আরও আছে।'

'আমি আর দেখব না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।'

লোকটা বিনীতভাবে বলল, 'যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।'

মহাকাশযান ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা—টরোটা যেন পাই।'

'হবে, হবে।' বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

হরবাবুর অভিজ্ঞতা

নিশুত রাতে হরবাবু নির্জন অন্ধকার মেঠো পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বৃষ্টি বাদলার দিন। পথ জলকাদায় দুর্গম। তার ওপর আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হরবাবুর টর্চ আর ছাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। টর্চের আলো নিবুনিবু হয়ে আসছে আর হাওয়ায় ছাতা উলটে যাওয়ার ভয়। বর্ষা বাদলায় সাপখোপের ভয়ও বড়ো কম নয়। গর্তটর্ত বুজে যাওয়ায় তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ডাঙাজমির খোঁজে পথে ঘাটে উঠে আসে।

হরবাবুর অবশ্যই এই নিশুতরাতে পৌঁছোনোর কথা নয়। কিন্তু ট্রেনটা এমন লেট করল যে হরিণডাঙ্গা স্টেশনে নামলেনই তো রাত সাড়ে দশটায়। গোরুর গাড়ির খোঁজ করে দেখলেন সব ভোঁ ভোঁ, এমনকী তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁ গোবিন্দপুরে যাওয়ার সঙ্গী— সাথিও কেউ জুটল না। গোবিন্দপুর না হোক দু—তিন মাইল রাস্তা। হরবাবুর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তাঁর শালার বিয়ে। হরবাবুর স্ত্রী চার—পাঁচদিন আগেই ছেলে—মেয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। হরবাবুর জন্যে তাঁরা সব পথ চেয়ে থাকবে।

সামনেই তুলসীপোতার জঙ্গল। একটু ভয়ের জায়গা, আধমাইলটাক খুবই নির্জন রাস্তা। আশেপাশে বসতি নেই। হরবাবু কালী—দুর্গা স্মরণ করতে করতে যাচ্ছেন। বুকটা একটু কাঁপছেও। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীটা যে কেন এত পেছিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ফিরিঙ্গির হাট ছাড়িয়ে ডাইনে মোড় নিতে হবে। কিন্তু এত জম্পেশ অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, টর্চবাতির আলোর চার—পাঁচ হাতের বেশি যাচ্ছেও না। বড়োই বিপদ।

হরবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, — ওঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা না যায়। ডান দিকে তুলসীপোতার রাস্তার মুখটা খুঁজে পেয়েও দমে গেলেন হরবাবু। এতক্ষণ যাইহোক শক্ত জমির ওপর হাঁটছিলেন। এবার একেবারে থকথকে কাদা।

—হরি হে, এই রাস্তায় মানুষ যেতে পারে! পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য নেই।

হরবাবু আপনমনে কথাটা বলে ফেলতেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, —তা যা বলেছেন।

হরবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যে আর একটু হলেই তাঁর হার্ট ফেল হত। পিছনে তাকিয়ে দেখেন একটা রোগা আর লম্বাপানা লোক। হরবাবুর সঙ্গে শালার বউয়ের জন্য গড়ানো একছড়া হার আছে। কিছু পয়সাও। লোকটা ডাকাত নাকি? হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কে?

—চিনবেন না। এদিক পানেই যাচ্ছিলাম।

—অ। তা ভালো।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গোবিন্দপুর নাকি?

হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন,— হ্যাঁ, সেখানেই যাওয়ার কথা।

লোকটা একটু হাসল,— যেতে পারবেন কি? এখন তো এই কাদা দেখছেন, গোড়ালি অবধি। এরপর হাঁটু অবধি গেঁথে যাবে।

—তাহলে উপায়? আমার যে না গেলেই নয়।

লোকটা একটু হেসে বলে, —উপায় কাল সকাল অবধি বসে থাকা। তারপর ভোরবেলা ফিরিঙ্গির হাট থেকে গোরুর গাড়ি ধরে শিয়াখালি আর চটের হাট হয়ে গোবিন্দপুর যাওয়া। তাতে অবশ্য রাস্তাটা বেশি পড়বে। প্রায় সাত—আট মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে তুলসীপোতা দিয়ে যাতায়াত নেই।

—রাত এখানে কাটাব? থাকব কোথায়?

—তার আর ভাবনা কী? একটু এগোলে ওই জঙ্গলের মধ্যে আমার দিব্যি ঘর আছে। আরামে থাকবেন।

হরবাবু খুব দোটানায় পড়লেন বটে, কিন্তু কী আর করেন। লোকটা যদি তাঁর সব কেড়েকুড়েও নেয় তাহলে কিছু করার নেই বটে। কিন্তু গোবিন্দপুর যে পৌঁছোনো যাবে না তা বুঝতে পারছেন।

আমার পিছু পিছু আসুন। —বলে লোটা একটু এগিয়ে গেল।

হরবাবু খুব ভয়ে ভয়ে আর সংকোচের সঙ্গে তার পিছু পিছু যেতে বললেন, —তা আপনার বাড়ি বুঝি ফিরিঙ্গির হাটেই?

—তা বলতে পারেন। যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়। আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তবে আপনার এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য নয় তা খুব ঠিক কথা। এখানে হরকিত, গুবজোর, সেরোঙ্গি কিছুই পাওয়া যায় না। বড্ড অসুবিধে।

লোকটা পাগল নাকি! হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, — কী পাওয়া যায় না বললেন?

বলে লাভ কী? আপনি পারবেন জোগাড় করে দিতে? ওসব হচ্ছে খুব ভালো ভালো সব সবজি।

জন্মে যে নামও শুনিনি। এসব কি বিলেতে হয়?

না মশাই না। বিলেতের বাজারও চষে ফেলেছি।

খুবই আশ্চর্য হয়ে হরবাবু বললেন, —বিলেতেও গেছেন বুঝি?

—কোথায় যাইনি মশায়! ছোটো গ্রহ, এমুড়ো ওমুড়ো টহল দিতে কতক্ষণই বা লাগে!

হরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই দুর্যোগের রাতে শেষে কি পাগলের পাল্লায় পড়লেন?

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, — নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে থাকা মশাই। নইলে এই অখাদ্য জায়গায় কেউ থাকে? এখানে ফোরঙ্গলিথুয়াম হয় না, কাঙ্গারাঙ্গা নেই, ফেজুয়া নই— এ জায়গায় থাকা যায়?

হরবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন,— এগুলো কি সবজি?

—আরে না। আপনাকে এসব বুঝিয়েই বা লাভ কী? আপনি এসব কখনো দেখেননি জানেনও না। ফোরঙ্গলিথুয়াম একটা ভারি আমোদ—প্রমোদের ব্যাপার। কাঙ্গারাঙ্গা হল খেলা। ফেজুয়া হল— নাঃ, এটা বুঝবেন না।

হরবাবু মাথা নেড়ে বললেন,— আজ্ঞে না। আমার মাথায় ঠিক সেঁধোচ্ছে না। তা মশাইয়ের দেশ কি আফ্রিকা?

—হাসালেন মশাই। আফ্রিকা হলে চিন্তা কী ছিল! এ হল জরিভেলি লোকের ব্যাপার।

—জরিভেলি?

—শুধু জরিভেলি নয়, জরিভেলি লোক। এই আপনাদের মোটে নটি গ্রহ নয়, আমাদের ফুন্দকনীকে ঘিরে পাঁচ হাজার গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সবকটা নিয়ে জরিভেলি লোক। এলাহি কাণ্ড।

হরবাবু মূর্ছা গেলেন না। কারণ লোকটা পাগল। আবোলতাবোল বকছে।

কিন্তু কয়েক কদম যেতে—না—যেতেই হরবাবু যে জিনিসটা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোটোখাটো একটা বাড়ির মতো একখানা মহাকাশযান। আলোটালো জ্বলছে। ভারি ঝলমল করছে জিনিসটা।

—আসুন, ভিতরে আসুন। আমি একা মানুষ, আপনার আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটবে।

ভিতরে ঢুকে হরবাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়ারই জোগাড়। হাজার কলকবজা, হাজার কিম্ভূত সব জিনিস। কোথাও আলো জ্বলছে নিবছে, কোথাও হুস করে শব্দ হল, কোথাও পিঁ পিঁ করে যেন বেজে গেল, কোথাও একটা যন্ত্র থেকে একটা গলার স্বর অচেনা ভাষায় নাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে— লং পজং ঢাকাকাল লং পজং পাকালাব....

হরবাবুর মাথা ঘুরছিল। তিনি উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলে পড়লেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এক গেলাস কালোমতো কী একটা জিনিস এনে তাঁর হাতে নিয়ে বলল, —খেয়ে ফেলুন।

হরবাবু বুক ঠুকে খেয়ে ফেললেন। একবারই তো মরবেন। তবে স্বাদটা ভারি অদ্ভুত। ভিতরটা যেন আরামে ভরে গেল।

—এসব কী হচ্ছে মশাই বলুন তো?

লম্বা লোকটা ব্যাজার মুখে বলল,— কী আর হবে? আমার এখানে পোস্টিং হয়েছে। পাক্কা তিনটি মাস— আপনাদের হিসেবে— এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।

—কীসের পোস্টিং?

—আর বলবেন না মশাই। এতদিন জরিভেলির বাইরে আমরা কোথাও যেতাম না। এখন হুকুম হয়েছে, কাছেপিঠে যে—কটা লোক আছে সেগুলো সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সোজা কাজ নাকি মশাই? যেখানে পোস্টিং হবে, সেখানকার ভাষা শেখো রে, সেখানকার আদবকায়দা রপ্ত করো রে, সেখানকার অখাদ্য খেয়ে পেট ভরাওরে। নাঃ, চাকরিটা আর পোষাচ্ছে না।

হরবাবু একটু একটু বুঝতে পারছেন, লোকটা গুল মারছে না। তিনি উঠে একটা চেয়ারগোছের জিনিসে বসে পড়ে বললেন,— আপনাদের জরিভেলি কতদূর?

—বেশি নয়। আপনাদের হিসেবে মাত্র একশো তেত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, তা আর বেশি কি? আমার এই গাড়িতে ঘণ্টাখানেক লাগে।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ।

হরবাবু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন,— তাহলে আর আমার শ্বশুরবাড়ি গোবিন্দপুর এমন কী দূর?

—কিছু না, কিছু না।

হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি—কী—মরি করে ছুটতে লাগলেন।

সময় সরণী
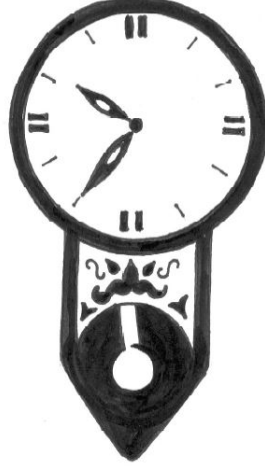
আচ্ছা, এটা কি সুধীরবাবুর বাড়ি?

হ্যাঁ, আমিই সুধীর ভটচায। আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ঠিক চিনবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আসা। ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

এখানে বোধহয় দরজার বাইরে চটি ছেড়ে ঢোকার নিয়ম, তাই না?

তা নিয়ম একটা আছে বটে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে—

না, না, ঠিক আছে। চটি ছেড়েই আসছি।

আসুন, বসুন।

আপনাদের এ জায়গাটা বেশ গরম।

তা তো বটেই। গ্রীষ্মকালে এ দেশে গরম পড়ে। আপনি কি এ দেশে থাকেন না?

না, না, আমিও এ দেশেই থাকি। মাত্র কয়েক মাইল তফাতে। তবে আমাদের ওখানে বিশেষ গরম নেই।

কয়েক মাইলের তফাতে তো আর দার্জিলিং পাহাড় নয় মশাই।

না, না, অত দূরের কথা বলছি না। আমি শ্যামবাজারের দিকটায় থাকি।

তা শ্যামবাজারে গরমের অভাব কী? কালও তো হাতিবাগানে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি। আপনি বোধহয় এয়ার কন্ডিশনে থাকেন।

খানিকটা তাই।

তাই বলুন।

তবে সেটা ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনিং।

সেটা আবার কীরকম?

এমন সব গাছ আছে যা কুলিং সিস্টেমের কাজ করে।

গাছ! শ্যামবাজারে আবার গাছ কোথায় পেলেন?

সে কথা থাক। আগে জরুরি কথাটা সেরে নিই।

হ্যাঁ বলুন।
এখন ঘড়িতে বাজছে সকাল ন—টা। ঠিক তো।
হ্যাঁ। কাঁটায় কাঁটায়।
ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এ বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটবে। আর সেইজন্যই আমার আসা।
ঘটনা! কী ঘটনা বলুন তো! দিনে—দুপুরে ডাকাত পড়বে নাকি?
না, না। অতবড়ো ঘটনা নয়। খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা, কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর।
আপনি কি জ্যোতিষী?
আজ্ঞে না। তবে আমি লজিক্যাল।
তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কি পাগল?
দাঁড়ান, আমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আসলে এখনকার বাংলা ভাষায় কথা বলতে তেমন অভ্যস্ত নই তো, তাই।
আপনি কি বাঙালি নন?
বাঙালিই, তবে একটু অন্যরকম বাঙালি। আমাদের বাংলাটা একটু অন্যরকম।
তা হতেই পারে। শুনেছি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাংলা বেশ অন্যরকম।
প্রবলেমটা অনেকটা সেরকমই। যাই হোক, একটু বুঝিয়ে বলছি।
বলুন।
আপনার ছেলের নাম কিংশুক ভট্টাচার্য তো?
হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কী করে?
তিনি আমার দাদু।
দাদু! বলেন কী মশাই! আপনার মাথায় তো বেশ গণ্ডগোল! আমার ছেলের বয়স মাত্র আট মাস। আর কিংশুক নামটাই যে শেষ অবধি রাখা হবে তারও ঠিক নেই।
প্লিজ। দয়া করে ওঁর নাম কিংশুকই রাখবেন। দু—হাজার বাষট্টি সালে কিংশুক ভট্টাচার্য নামেই উনি নোবেল প্রাইজ পাবেন। নাম পালটালে অনেক গণ্ডগোল হয়ে যাবে।
আচ্ছা মশাই, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে।
ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আমি সত্যিই কিংশুক ভট্টাচার্যের নাতি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।
আপনি কি টাইম মেশিনের গপ্পো ফাঁদবেন? ভবিষ্যৎ থেকে উড়ে এসেছেন! ওসব গুলগল্প আমাদের ঢের জানা আছে। আমরা ঘনাদার গল্প অনেক পড়েছি। স্টিফেন হকিং বলেই দিয়েছেন টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। মিচকি মিচকি হাসছেন যে!
স্টিফেন হকিং তো আর সব সত্যের সন্ধান জানতেন না, অধিকাংশ সত্যই হল আপেক্ষিক। এক এক দেশে এক এক সময়ে এক এক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক একটা জিনিসকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমি সত্যিই সময়ের সরণী বেয়ে এসেছি। আমি সম্পর্কে আপনার ছেলে কিংশুকের নাতি, আপনার পুতি।
হাঃ হাঃ, মশাই, বেড়ে গল্প ফেঁদেছেন। আসল কথাটা কী বলুন তো!
সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আমরা সহজে টাইম ট্রাভেল করি না, তাতে অনেক রকম বিপত্তি হয়। যা বলছি দয়া করে শুনুন। বেলা দশটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আপনার বন্ধু বঙ্কুবিহারী আর অরূপ মাইতি আসবেন। দশটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ আপনার স্ত্রী তাঁদের দু—জনকে দু—টি করে শিঙাড়া পরিবেশন করবেন। শিঙাড়াগুলো আপনি গতকালই একটি মাড়োয়ারি দোকান থেকে কিনে এনেছেন, কিন্তু অত্যধিক ঝাল বলে খেতে পারেননি, ফ্রিজে রেখে দেওয়া আছে। আপনার স্ত্রী সেগুলোই মাইক্রো ওয়েভে গরম করে

দেবেন। দশটা বত্রিশ নাগাদ অরূপ ও বঙ্কুবিহারী ঝালে হাঁসফাঁস করতে করতে ঠান্ডা জল চাইবেন। আপনার স্ত্রী ফ্রিজের জল নিয়ে এ ঘরে আসবার উপক্রম করবেন। আর তখনই ঘটনাটা ঘটবে। আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

একটু অবাক হচ্ছি। শিঙাড়ার ঘটনাটা সত্যি। বাকিগুলো সত্যি কিনা—

সত্যি। একটু বাদেই বুঝবেন।

আচ্ছা বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কী?

আপনার স্ত্রীর হাত থেকে একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ভাঙবে এবং গেলাসের জল পড়ে পিছল মেঝেতে আপনার স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ে ফিমার বোন ভাঙবেন।

সর্বনাশ!

আরও সর্বনাশ হল ফিমার বোন ভেঙে আপনার স্ত্রী শেষ অবধি পঙ্গু হয়ে যাবেন এবং তার ফলে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না।

চিনাংশুক! সে কে?

কিংশুকের ছোটোভাই।

বলেন কী?

যা বলছি দয়া করে শুনুন। চিনাংশুক না জন্মালে খুবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনি নিজে তো পাগল বটেই, কিন্তু আপনার পাগলামির চোটে যে আমারও পাগল হওয়ার জোগাড়! কীসব আবোল—তাবোল বকছেন?

রেগে যাবেন না, মাথা ঠান্ডা করুন। সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সমস্যাটা কী?

সমস্যা হচ্ছে এক গেলাস জল। ওই এক গেলাস জলই ভাবীকালের ইতিহাস পালটে দিতে পারে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

আপনার গুলগপ্পে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসুন এখন।

আপনার যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য দু—হাজার বাষট্টি সালের একটি খবরের কাগজ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এটি অবশ্য আপনাদের সংবাদপত্রের মতো নিউজপ্রিন্টে ছাপা নয়, এটি ছাপা হয়েছে সিনথেটিক পেপারে। এই যে ফ্রন্ট পেজে বড়ো হেডিং—এ খবরটা দেখুন।

ও বাবা! এ তো দেখছি কিংশুক ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যায় সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! এটা জালি ব্যাপার নয় তো?

ওই খবরের কাগজটা যে মেটেরিয়ালে ছাপা হয়েছে তা আপনি কখনো দেখেছেন?

না মশাই! এ তো ভারি নরম অথচ মোলায়েম জিনিস। আর ছাপাও তো দারুণ সুন্দর। কিন্তু ভাষাটা একটু যেন কেমন কেমন। সব বাক্য ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

ভাষা এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল জিনিস। আমাদের আমলে ভাষা অনেক সংকেতময় হয়েছে।

তাই দেখছি।

এখন কি একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে?

আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি। তা আপনি যদি টাইম ট্রাভেলার হয়েই থাকেন তাহলে আপনার গাড়ি কই?

টাইম ট্রাভেল করতে গাড়ি লাগে নাকি?

সিনেমায়—টিনেমায় তাই তো দেখি।

ও তো আজগুবি ব্যাপার। তবে গাড়ি না হলেও একটা শ্যাফট বা লম্বা নলের মতো জিনিস আছে। ওর টেকনোলজি আপনি ঠিক বুঝবেন না। তবে শ্যাফটটাও আপনার বাড়ির সামনের ওই খেলার মাঠটায়

রয়েছে। ওটা দেখতে পাবেন না, কারণ ওটা ওখানে রয়েছে রাত তিনটের স্লটে। দিনে—দুপুরে শ্যাফটটা দেখতে পেলে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল হবে।

যাক গে, এখন খোলসা করে বলুন ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল, সময়ের শরীরে মাঝে মাঝে এক—আধটা কুঞ্চন দেখা দেয়। ওই কুঞ্চনের ফলে অনেক সময়ে পরবর্তী ঘটনাবলিতে প্রভাব পড়ে। আমরা তেমন বিপজ্জনক কুঞ্চন দেখলে সেটাকে একটু মসৃণ করে দিই মাত্র। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিংশুক ভট্টাচার্য দু—হাজার বাষট্টি সালে যে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর যদি আজ ফিমার বোন ভাঙে এবং চিনাংশুক না জন্মায় তাহলে কিংশুক ভট্টাচার্য সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করতে পারবেন না।

কেন মশাই?

তার কারণ কিংশুক একমাত্র সন্তান হলে তাকে আপনারা অত্যধিক আদর দেবেন এবং অতি আদরে সে অলস অপদার্থ এবং বখা হয়ে যাবে। ফলে তার পক্ষে আর আবিষ্কারটা সম্ভব হবে না। চিনাংশুক জন্মালে কিন্তু আপনাদের মনোযোগ যে অনেকটাই কেড়ে নেবে এবং কিংশুক ভট্টাচার্যও অ্যাকটিভ থাকবেন।

বটে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

হ্যাঁ। কিন্তু দশটা পনেরো বাজে। প্রস্তুত হোন।

কী করতে হবে মশাই?

আপনি কিছুই করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রী যখন জলটা আনবেন তখন উঠে গিয়ে আপনি ওঁর হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নেবেন। টাইমিংটা কিন্তু খুব জরুরি। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হলেই ব্যাপারটা কেঁচে যাবে।

বুঝেছি।

খুব সাবধান। ওই ডোরবেল বাজছে, আপনার বন্ধুরা এসেছেন।

দরজা কি খুলে দেবো?

দিন। আমার নাম অশঙ্ক ভট্টাচার্য। আমাকে আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন বন্ধুদের কাছে।

তাই হবে। বলে গিয়ে সুধীরবাবু দরজা খুলে দেখলেন সত্যিই বন্ধু আর অরূপ এসেছে।

তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যেমননি অশঙ্ক বলেছিল তেমনই ঘটতে লাগল। ঝাল শিঙাড়া খেয়ে দু—জনেই বলে উঠল, বউদি ঠান্ডা জল দিন।

অশঙ্ক চোখের ইশারা করে সুধীরবাবুকে বলল, এইবার! খুব সাবধান কিন্তু—

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন ফ্রিজের বোতল বের করে গেলাসে জল ঢালছেন তখনই গিয়ে বললেন, দাও গেলাস দুটো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি! তুমি নেবে কেন?

আহা, দাও না। তুমি পড়ে—টড়ে গেলে যে সর্বনাশ!

পড়ব! আমি পড়ব কেন?

পড়ারই কথা কিনা। আর তুমি পড়লে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না। তাহলে যে সর্বনাশ।

বলি সকালেই কি গাঁজা টেনেছো নাকি? কীসব বাজে বকছো? সরো, জল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আহা—হা, করো কী, করো কী!

বলে সুধীরবাবু তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাস দুটো একরকম কেড়েই নিতে গেলেন। আর টানা—হ্যাঁচড়ায় একটা গেলাস হাত ফসকে পড়ে শতখান হয়ে ভাঙল। এবং স্ত্রী নয়, সুধীরবাবু নিজেই পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সঙ্গে অশঙ্কও। ধরাধরি করে তোলা হল তাঁকে। বাঁ হাতটায় প্রচণ্ড লেগেছে।

বন্ধু ডাক্তার। হাতটা ভালো করে দেখে বলল, কনুইয়ের কাছটা তো ফ্র্যাকচার হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভোগাবে।

সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি। অশঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, কী হে বাপু, কেমন সাপলে দিয়েছি?

অশঙ্ক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সময়ের যে কুঞ্চনটা ছিল সেটা এখন সটান হয়ে গেছে।

উল্কা ও ষষ্ঠীচরণ

ষষ্ঠীচরণ পায়চারি করছিল। আর পায়চারি করতে বেশ ভালোও লাগছিল তার। তবে কাজটা যত সহজ শোনাচ্ছে ততটা নয়। আসলে সে পাহারায় আছে। পায়চারি করতে করতে তাকে বিশেষ নজরও রাখতে হচ্ছে। তার ওপর বহু মানুষের মরন—বাঁচন নির্ভর করছে। একটু ভুলচুক হলেই বা নজরদারিতে গাফিলতি ঘটলেই অতি বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

তার কানে হেডফোন লাগানো আছে। ঘ্যানাবাবু হচ্ছেন অপারেশন ম্যানেজার। ফোনে হঠাৎ তাঁর হেঁড়ে গলা শোনা গেল, বলি, ওহে ষষ্ঠীচরণ, ঘুমিয়ে পড়োনি তো!

আজ্ঞে না স্যার, দিব্যি জেগে আছি।

হুঁশিয়ার থেকো হে, উল্কাটার মতিগতি খুব ভালো ঠেকছে না। ব্যাটা চাঁদের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে বলে মনে হচ্ছে। দূরেই আছে এখনও, তবে যেকোনো সময়ে এসে পড়তে পারে।

চিন্তা করবেন না স্যার, আমি নজর রাখছি।

তুরপুনটা রিলিজ করার সময় হলেই তোমাকে সিগন্যাল দেবো। ভগবানের নাম করে ছেড়ো হে, বড্ড সাবধানে কাজ করতে হবে।

যে আজ্ঞে, শুধু একটা কথা স্যার।

কথা! কী কথা বলে ফেল।

আজ্ঞে, আমার প্রমোশনটা অনেকদিন আটকে আছে।

আরে, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি আগে রাক্ষসটাকে তো আটকাও। কাজটা উদ্ধার হলে বরদাবাবু খুশি হবেন। তখন তোমারও হিল্লে হয়ে যাবে।

যে আজ্ঞে।

ষষ্ঠীচরণ ফের পায়চারি করতে থাকে। অন্যমনস্ক হলে চলবে না। ঘুম পেলে চলব না। ভুলচুক হলে চাকরি যাবে। ষষ্ঠীচরণ গরিব মানুষ, চাকরি গেলে খুব সমস্যার পড়ে যাবে। আর সেইজন্য সে পায়চারির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।

অসুবিধের ব্যাপার হল, সে পায়চারি করছে মহাশূন্যে একটা বিশাল কৃত্রিম স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর। কোমরে অবশ্য ধাতব দড়ি বাঁধা আছে স্যাটেলাইটের সঙ্গে। ছিটকে যাওয়ার ভয় নেই। আর পায়ে আছে বিশেষ ধরনের সোলওয়ালা জুতো যাতে পা স্যাটেলাইটের সঙ্গে সেঁটে থাকে। স্যাটেলাইটের ওপর একটা মাউন্ট করা হারপুন। হারপুনের ডগায় ওয়ারহেড লাগানো। এই অস্ত্র দিয়েই নচ্ছার উল্কাটাকে টিট করতে হবে। ষষ্ঠীচরণ খুবই ভালো তিরন্দাজ। উল্কাটার গতিবিধি কিছু বিচিত্র বলে শুধু যন্ত্র দিয়ে লক্ষ্যভেদের ওপর

নির্ভর না করে ষষ্ঠীচরণকে ডাকা হয়েছে। হারপুনটা যন্ত্রের সাহায্যেই নিক্ষেপ করা হবে বটে, তবে ষষ্ঠীচরণ প্রয়োজনে যন্ত্রটাকে সাহায্য করবে।

কানে লাগানো ফোনে তার গাঁ মুকুন্দপুর থেকে মায়ের গলা পাওয়া গেল। ও বাবা ষষ্ঠীচরণ, কখন থেকে আকাশে ঝুলে আছিস বাবা, বলি কিছু খেয়েছিস? পেটে দানাপানি কিছু পড়েছে?

হ্যাঁ মা, এরা বেশ ভালো খাইয়েছে। মাংস, ভাত, রসগোল্লা।

তবে যে শুনি, আকাশে নাকি পাতের ভাত মাছ সব পাত ছেড়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়। খেলি কী করে?

সে অনেক ব্যবস্থা আছে। টিউবে করে খাবার দেয়। টুথপেস্টের মতো টিপে টিপে বের করে খেতে হয়।

ও আবার কীরকম অলক্ষুণে খাওয়া?

সেই খাওয়া খুব মজার, গিয়ে সব বলব'খন।

তা হ্যাঁ বাবা ষষ্ঠী, কতটা ওপরে উঠেছিস বল তো!

সে অনেক ওপরে মা, কয়েক শো মাইল তো হবেই।,

ও বাবা, তাহলে স্বর্গের কাছাকাছিই হবে বোধ হয়। তা ওখান থেকে স্বর্গের বাগান—টাগান দেখা যায়? শিব, দুগ্গা কাউকে দেখলি বাবা? দেখলে পেন্নমা—টেন্নাম করিস। আর আমাদের দুঃখ—দুর্দশার কথাও একটু জানিয়ে রাখিস।

স্বর্গ বোধহয় আরও পরের দিকটায় হবে। ঠিক আছে ঠাকুর—দেবতা কাউকে দেখলে বলব'খন।

দেখিস বাবা, পা পিছলে পড়ে—টড়ে যাসনি। অত ওপর থেকে পড়লে হাত—পা ভাঙবে।

না মা, পড়ার কোনো ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও।

দুর্গা দুর্গা। তা সেই মুখপোড়া উল্কাটা কি এখনও আসেনি?

না মা, তবে এল বলে, আর দেরি নেই।

মাকে বেশি জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। মা জানে আকাশের ওপর দিকটায় স্বর্গ। প্রকৃত আকাশ কি বস্তু তা মা জানে না, জেনে আর দরকারও নেই।

উদবিগ্ন মুখে আকাশের দিকে চেয়ে ষষ্ঠীচরণ উল্কাটার গতিবিধি নজরে আনার চেষ্টা করছিল। চাঁদটা খুবই কাছে। মাথার ওপর এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আর বিরাট বড়োও লাগছে চাঁদকে।

হঠাৎ তার কানে লাগানো ফোনে একটা বাজখাঁই গলা একেবারে ফেটে পড়ল, বলি ষষ্ঠীচরণ, শুনলুম দেনার দায়ে জেরবার হয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার তালে আকাশে গিয়ে গা—ঢাকা দিয়েছো। ওতে কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। চিরকাল তো আর ঝুল খেয়ে থাকতে পারবে না বাবা। ত্রিশ হাজার টাকার দেনা এখন সুদে—আসলে গিয়ে তেষট্টি হাজার সাতশো বাহাত্তরে দাঁড়িয়েছে। এক মাসের মধ্যে শোধ না দিলে ঘটি—বাটি চাটি করে ছাড়ব। বুঝেছো?

ষষ্ঠীচরণ খুব বুঝেছে। বিগলিত ভাব দেখিয়ে ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, ভাববেন না নগেনবাবু, টাকাটা ঠিকই দিয়ে দেবো। কয়েকটা দিন একটু অসুবিধের মধ্যে আছি। কাঁচা বাড়িতে মা—বাবার বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল বলে বাড়িটা পাকা করতে হল কিনা।

মনে রেখো বাপু, জমির দলিল আমার কাছে বাঁধা রেখেছো, টাকা ঠিকমতো শোধ না দিলে জমি নিয়ে নেবো। এখন আইন বহুৎ কড়া।

যে আজ্ঞে, জমি গেলে আমরা খাবোই বা কী বলুন!

আকাশ থেকে নেমে তো এসো, তারপর মজাটা টের পাবে।

নগেনবাবুর কথা শেষ হতে—না—হতেই হরিপদ সাহার ফোন।

বলি ও ষষ্ঠী, আকাশে উঠে কি হাতে চাঁদ পেয়েছো নাকি হে? আমার দোকানে কত বাকি ফেলেছো জানো? দু—হাজার তিনশো তেইশ টাকা, বুঝলে? আর বাপু, ধারবাকিতে মাল দেওয়া আমার পোষাবে না

বলে দিলুম পষ্ট করে। আমার সাফ কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল।

ভারি কাকুতিমিনতি করে ষষ্ঠীচরণ বলে, আর দুটো দিন সবুর করুন হরিপদবাবু, আমি ফিরে গিয়েই ধার মিটিয়ে দেবো। বাকিতে মাল না দিলে যে আমার বুড়ো বাপ—মা না খেয়ে মরবে।

না বাপু, আমিও ছাপোষা মানুষ, মুদির দোকান থেকেই আমারও সংসার চালাতে হয়। আর বাকিতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর তিনটে দিন হরিবাবু, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এলুম বলে।

দেখো বাপু, কথার নড়চড় না হয়।

মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল ষষ্ঠীচরণের। মা—বাপ আর ভাই ও বোনদের সে বড়ো ভালোবাসে। কিন্তু তারা বড়োই গরিব। সে মহাকাশ গবেষণাগারের সামান্য টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। সামান্য বেতনে সংসার চালাতে পারে না। সে ক্রস বোতে তিরন্দাজি শিখেছিল এক সাহেবের কাছে। তাতে একসময়ে তার একটু নামও হয়েছিল।

কিছুদিন আগে আকাশের এক কোণে একটা বড়োসড়ো উল্কার সন্ধান পায় মার্কিন আর রুশ বিজ্ঞানীরা। হিসেব—নিকেশ করে দেখা গেছে সেটা পৃথিবীতে এসে পড়বে। এবং পড়বে ভারতবর্ষেরই কোথাও। কিন্তু মার্কিনীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুব খারাপ বলে উল্কাটাকে মহাকাশে অনেক দূরে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিনীরা মোটেই গা করেনি। কিন্তু বহু দূরে রকেট পাঠিয়ে উল্কাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার টেকনোলজি মার্কিনী ছাড়া আর কারও নেই। রুশরা একসময়ে ভারতের বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং তারা ব্যবসা—বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ করে সুখে—স্বচ্ছন্দে আছে। মহাকাশ নিয়ে চর্চাতেও তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। তবে ভারত গরিব দেশ হলেও মহাকাশ গবেষণায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তাদের আন্তর্জাতিক মহাকাশ দূষণ দফতর থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে উল্কাটা ধ্বংস করতে তারা যেন বিস্ফোরক ব্যবহার না করে। কারণ মহাকাশে এখন কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে নানা উচ্চচতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বিস্ফোরকে তাদের ক্ষতি হতে পারে। তাই আপাতত শক্তিশালী হারপুন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং কম্পিউটার দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই যন্ত্র ব্যবহারের সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ষষ্ঠীচরণ। কারণ সে ক্রস বো তিরন্দাজিতে খুবই পাকা।

আর সেজন্যই ষষ্ঠীচরণ আজ মহাকাশে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বড়ো অনটনের সংসার। এ কাজটা সফলভাবে করতে পারলে হয়তো তার প্রমোশনটা হবে। কিছু পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে। বাড়ি বাবদ কুড়ি লাখ টাকা ব্যাঙ্কের ধার খানিকটা যদি শোধ দেওয়া যায়। তার চারদিকেই শুধু পাওনাদার।

কানে লাগানো ফোনে অরোরা সাহেবের গলা পাওয়া গেল, আরে এই বুরবক ষষ্ঠীচরণ, তু কিয়া খোয়াব মে হো? আরে উও খতরনাক মিটিওর তো তুরন্ত আ রাহা হ্যায়। গেট রেডি ম্যান।

ষষ্ঠীচরণ তাকিয়ে দেখে সত্যিই চাঁদের পিছন থেকে বেশ বড়ো একটা মেটে সোনালি রঙের গোলা ছুটে আসছে। তীব্র গতি। একটু বাদেই সেটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে উঠবে। তারপর সোজা গিয়ে মধ্যভারতের কোথাও আছড়ে পড়ে বিশাল এলাকা ধ্বংস করে দেবে। হারপুন ঠিকমতো গেঁথে দিতে পারলে ওটার মাথায় যে একটা ওয়ারহেড লাগানো আছে তাতে সোনিক বুম সৃষ্টি হয়ে উল্কাটিকে বহু খণ্ডে টুকরো করে দেবে। আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীতে পড়ার আগেই আবহমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ষষ্ঠীচরণ তার হারপুন ঘুরিয়ে তৎপর হল। এখন একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশ।

উল্কাটা এত দ্রুত আসছে যে লক্ষ্য স্থির করাই কঠিন। ষষ্ঠী হারপুনে শুয়ে টেলিস্কোপিক ভিউ ফাউন্ডারে চোখ রেখে একটু অবাক হয়ে গেল। উল্কাটা সাধারণ জিনিস নয়। ঠিক অপরিশোধিত সোনার মতো পাটকিলে

সোনালি রং। আড়েদীঘে প্রায় সিকি কিলোমিটার তো হবেই।

ষষ্ঠীচরণ খুব ঠান্ডা মাথায় দূরত্বটা মেপে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে সরাসরি বস্তুটাকে লক্ষ করে রিলিজ বাটন চাপলে কাজ হবে না, কারণ হারপুন গিয়ে লাগবার আগেই উল্কা জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। সুতরাং হারপুন ছাড়তে হবে কয়েক সেকেন্ড আগে উল্কার সম্ভাব্য গতিপথের দিকে তাক করে।

কানে লাগানো ফোনে একটা মিঠে গলা শোনা গেল, রামরাম ষষ্ঠীবাবু, ভালো আছেন তো! তবিয়ৎ তন্দুরস্ত আছে তো! বলছিলাম কী, আপনাকে আমি তিন লাখ রুপিয়া দিব, আপনি উল্কাটাকে ছোড়িয়ে দিন।

ষষ্ঠী অবাক হয়ে বলে, সে কী! কেন বলুন তো!

হামার ঝুনঝুনওয়ালা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এখুন খারাপ যাচ্ছে। ক্যালকুলেশন করে দেখলাম উল্কাটা যেখানে এসে পড়বে সেখানে হামার দশটা গো—ডাউন আছে। গো—ডাউনের সব মাল সরিয়ে নিয়ে তিন ক্রোর রুপিয়ার ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছি। উল্কাটা পড়লে হামার কিছু সুবিধা হবে। আপনার ওয়ান পারসেন্ট।

ষষ্ঠী নিবিষ্ট চোখে উল্কাটাকে লক্ষ করতে করতে বলল, ঝুনঝুনবাবু আপনি কি জানেন যে, আপনি খুব খারাপ লোক?

হাঁ হাঁ, কিঁউ জানব না! সবাই জানে, কিন্তু ভগওয়ানই তো আমাকে ভি পয়দা করেছেন। খারাপ লোকেরও কি দরকার নাই ষষ্ঠীবাবু? খারাপ লোকরাও তো সোসাইটিকে সারভিস দিচ্ছে, ঠিক কিনা বলুন?

উল্কাটা ভয়ংকর গতিবেগে চাঁদ পেরিয়ে চলে আসছে। ষষ্ঠী দাঁতে দাঁত পিষে ফোনটা অফ করে দিয়ে একাগ্র হল। গতিপথটা অনুমানে স্থির হয়ে নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে লাগল, সবটাই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। তিরন্দাজ হিসেবে তার পক্ষে যতটা সম্ভব নির্ভুল একটা দূরত্ব স্থির করে সে হারপুনের ট্রিগার টিপে দিল। একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে মসৃণ গতিতে হারপুনটা বেরিয়ে গেল নিক্ষেপ যন্ত্র থেকে।

উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে চেয়ে রইল ষষ্ঠীচরণ, রুপোলি রঙের বিশাল লম্বা হারপুনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালো আকাশ চিরে ছুটছে বিদ্যুতের গতিতে। ওদিক থেকে মেটে সোনার রঙের উল্কাটাও আসছে ভয়ংকর গতিতে। লাগবে তো! হে ভগবান! ক্যালকুলেশন যথাসাধ্য নির্ভুলই হয়েছে বলে তার ধারণা। কিন্তু ....

হারপুনটা লাগল, ষষ্ঠীচরণ যেখানে অবস্থান করছে তার খুব কাছেই ঘটল ঘটনাটা, খুব বেশি হলে আধ—কিলোমিটারের তফাতে। হারপুনটা সোজা গিয়ে উল্কার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সোনিক বুম চালু হয়ে গেল। আকস্মিক আঘাতে উল্কাটা কি একটু দোল খেল? গতি ব্যাহত হল একটু? পরমুহূর্তে একটা অপূর্ব নিঃশব্দ বিস্ফোরণে কালো আকাশে যেন ছড়িয়ে পড়ল ফুলঝুরির রংবেরং। শত খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে নানা দিকে ছিটকে যেতে লাগল বিদীর্ণ উল্কার টুকরোগুলো।

ষষ্ঠীচরণ ভারি তৃপ্তমুখে দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখছিল। মুখে একটু বোকাবোকা হাসি। আর ওইটেই ভুল করেছিল সে। কথা ছিল উল্কাটাকে ভেঙে দেওয়ার সময় সে সটান শুয়ে পড়বে, যাতে কোথাও বিপদ না ঘটে। খেয়াল ছিল না ষষ্ঠীর। হঠাৎ একটা বড়োসড়ো টুকরো ছিটকে এসে সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই যেন বিরাশি সিক্কার একটা চড় মেরে শুইয়ে দিল তাকে। ষষ্ঠী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর।

যখন জ্ঞান হল তখন সে কলকাতার এক হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চারপাশে সব হোমরাচোমরা মানুষ। এক ভারিক্কি ওপরওয়ালা বলল, বহোৎ খুব ষষ্ঠী, বাহাদুর হো।

আর একজন বলল, জোর বেঁচে গেছ হে। শ্র্যাপনেলটা প্রায় শেষ করে দিয়েছিল তোমাকে।

ষষ্ঠী হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে আমার মা—বাবার আশীর্বাদ আর ভগবানের দয়া।

তা তো বটেই, সরকার বাহাদুর তোমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার দেবে, বুঝেছো।

পঞ্চাশ লাখ!

শুধু তাই নয়। উল্কাটা ছিল পুরো সোনার। যে টুকরোটা এসে তোমার গায়ে লেগেছিল সেটার ওজন বাহাত্তর কেজি, ওটাও তোমাকে দেওয়া হবে।

ষষ্ঠী ফের অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভূত ও বিজ্ঞান

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হল আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দু—খানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ—নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গণ্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি—বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর একটা বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না। সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনো ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, কে?

কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।

বলো ভায়া।

বলি, তুমি এখন কোথায়?

আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু—হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখির মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।

বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।

তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কী এক জায়গায় থাকলে চলে?

তা নবগ্রামে কী মনে করে?

একটা সমস্যায় পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভালো।

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কোথায় আছো সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক—তে জিরো ইন করো।

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখির বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হল না। মেঘের বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুট্টে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু—হু করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও!

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, চোপ!

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করবে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে ধীরে চারদিকটার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দুশো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল।

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃদকম্প হতে লাগল। বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হল হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, আ—আপনি?

শূন্যে দু—খানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, বোসো হে পটল, কথা আছে।

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ার কোনো ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, ভয় পেয়ো না। আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠান্ডাও লাগবে না, পড়েও যাবে না। নীচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো—

মারা গেছি? হাঃ হাঃ হাঃ । আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হত। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা

করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, ভূত? কিন্তু ভূত তো—

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছো, কোনো স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া— এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, আজ্ঞে না।

তবে? বিজ্ঞান শিখে এসব না—মানার অভ্যাস মোটেই ভালো নয়, বুঝলে।

যে আজ্ঞে।

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন ল্যাবরেটারির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটারিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে।

আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

যে আজ্ঞে।

তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটারিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?

খুব খাবে, খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা—

উহুঁ, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত—বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। নইলে—

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাত করে বললেন, আজ্ঞে তাই হবে।

তাহলে চলো, নামা যাক।

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, এবার নিজে নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।

যে আজ্ঞে, বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

ঘুড়ির পিছনে

রিটায়ার করার পর গণপতিবাবুর আর সময় কাটে না। সকালটা বাজার করেন, তারপর বাগানে গাছগাছালির পরিচর্যা করে খানিক সময় কাটে। কিন্তু দুপুরবেলাটায় ঘুমের অভ্যাস নেই বলে ভারি বিরক্তিকর লাগে তাঁর।

শরৎকাল, দুপুরে বারান্দায় বসে বসে তিনি নানা দৃশ্য দেখতে থাকেন। সামনের মাঠে কিছু ছেলে ঘুড়ি ওড়ায় আর কয়েকটা ছেলে লম্বা বাঁশের আগায় শুকনো ডালপালা বেঁধে তৈরি করা লগি নিয়ে প্রস্তুত থাকে। ঘুড়ি ভো—কাট্টা হলেই তারা ঘুড়ির পিছনে ছুটতে থাকে।

এই কাটা—ঘুড়ি ধরার ব্যাপারটা গণপতিবাবুর বেশ পছন্দ হল। রোজই তাঁর চোখের সামনে দশ—বিশটা ঘুড়ি কাটা যায়। ছেলেবেলায় তাঁর ঘুড়ি ধরার নেশা ছিল।

গণপতিবাবু সুতরাং একটা বাঁশের আগায় শুকনো কাঁটাঝোপ বেঁধে নিজস্ব একটা লগি তৈরি করে নিলেন। কিন্তু বাচ্চচা বাচ্চচা ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করে তো আর ঘুড়ি ধরতে পারেন না। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা কথা আছে। তিনি তাই ছাদে উঠে ঘাপটি মেরে থাকতে লাগলেন। কাছেপিঠে ঘুড়ি পেলেই লগি দিয়ে খপ করে ধরে ফেলেন। তিন—চার দিনে তিনি প্রায় সাত—আটটা ঘুড়ি ধরলেন। ধরে খুবই আনন্দ আর উত্তেজনা হতে লাগল তাঁর। জীবনে খেলাধুলো বা লেখাপড়ায় কোনো প্রাইজ পাননি। বুড়ো বয়সে ঘুড়িগুলোকেই তাঁর প্রাইজ বলে মনে হতে লাগল। ঘুড়ি ধরার প্রবল নেশাও পেয়ে বসছিল তাঁকে।

সেদিন পাড়াসুদ্ধু সবাই ঝেঁটিয়ে কোথায় যেন বনভোজনে গেছে। দুপুরবেলা সামনের মাঠটা একদম ফাঁকা। ঘুড়ি ওড়ানোও নেই, ঘুড়ি ধরাও নেই। গণপতিবাবু ছাদ থেকে দেখতে পেলেন পুবদিকের আকাশে একটা লাল টুকটুকে ঘুড়ি উড়ছে, তার আবার বেশ লম্বা সাদা লেজ। উত্তরদিক থেকে একটা কালো বিটকেল চেহারার ঘুড়ি ধীরে ধীরে বেড়ে আসছে লাল ঘুড়িটার দিকে। কাটাকাটি হবে।

গণপতিবাবু হিসেব করে দেখলেন এই লড়াইয়ে যে ঘুড়িটা কাটা যাবে সেটা তাঁর ছাদের কাছে আসবে না। মাঠে আজ ছেলেপুলে কেউ নেই দেখে লগি হাতে গণপতিবাবু নেমে এলেন নীচে। মাঠে দাঁড়িয়ে ঘুড়ির লড়াই দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্যাঁচ লাগল। একটু টানাহ্যাঁচড়ার পরই হঠাৎ লাল ঘুড়িটা কাটা পড়ে উত্তুরে মিহিন বাতাসে দক্ষিণের দিকে ভেসে যেতে লাগল। গণপতিবাবু পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। দেখলেন এখনও এই বয়সেও তিনি বেশ ভালোই ছুটতে পারেন।

ঘুড়িটা ধীরে—সুস্থে হেলতে—দুলতে মাঠ পেরিয়ে রেললাইনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। পিছনে গণপতিবাবু। রেললাইন পেরিয়ে ফলসা গাছের জঙ্গল। তারপর একটা পতিত জমি পেরিয়ে মঙ্গলপুরের

জলা। বিশাল জলা। মাঝখানে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপের নাম কাঠুরেডাঙা। ঘন জঙ্গল আর সাপখোপের বাসা। কেউ সেখানে যায় না। আর জলারও খুব বদনাম আছে।

চোরা পাঁকের জন্য মঙ্গলপুরের জলা কুখ্যাত। কত মানুষ যে জলার পাঁকে তলিয়ে মারা গেছে তার আর হিসেব নেই। সুতরাং ওই জলা সবাই সভয়ে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু মুশকিল হল, ঘুড়িটা ওই জলার দিকেই চলেছে। ছুটতে ছুটতে গণপতিবাবুও জলার ধারে চলে এলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দেখলেন ঘুড়িটা যেন হাসতে হাসতে তাঁকে একটু বিদ্রূপ করেই জলার ওপর দিয়ে দ্বীপটার দিকে ভেসে যেতে লাগল।

গণপতিবাবু খুব দুঃসাহসী লোক নন ঠিকই, জলার চোরা পাঁকের কথাও তিনি জানেন, কিন্তু ঘুড়ি ধরার নেশা তাঁকে যন্ত্র ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।

জলায় পাঁক আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা সর্বত্র নয়। আর জল কোথাও কোমরসমানের বেশি উঁচু নয়, আর ঘুড়িটা এখনও নাগালের বাইরে যায়নি। মাত্র চার—পাঁচ হাতের মধ্যেই সুতোর আগাটা ভেসে যাচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই ধরা যায়।

চটিজোড়া ছেড়ে গণপতি হাঁটুজলে নেমে পড়ে লগি বাড়িয়ে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন ঘুড়িটাকে। এক চুলের জন্য পারলেন না। সুতরাং তিনি সাহস করে আরও দু—কদম এগোলেন। এবারেও ফসকাল। গণপতিবাবু জল ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল ঘুড়িটা না ধরলে তাঁর আজ রাতে ঘুমই হবে না।

ঘুড়ি এগোচ্ছে, গণপতিও এগোচ্ছেন। জল ক্রমশ হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর সমান হল। চোরা পাঁকে পড়েননি বটে, কিন্তু পায়ে যথেষ্ট থকথকে পাঁক লাগছে। পা পিছলেও যাচ্ছে। জলে বড়ো বড়ো ঘাস আর হোগলার মধ্যে ঢুকে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে। নানারকম পোকামাকড় গায়ে বসছে। পায়ে জোঁকও লেগেছে কয়েকটা। কিন্তু তাঁর এমন জেদ চেপেছে যে ঘুড়িটার আজ এটা এসপার—ওসপার না করেই ছাড়বেন না।

ঘুড়ি এগোয়, গণপতিবাবুও এগোন। ঘুড়ি ক্রমে ক্রমে জনহীন শ্বাপদসংকুল দ্বীপটার ঘন গাছগাছালির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে গণপতিবাবু।

কিছুক্ষণ পর ডাঙা জমিতে পা রেখে চারদিকে চেয়ে বুঝলেন তিনি দ্বীপটায় পৌঁছে গেছেন। স্মরণকালের মধ্যে আর কেউ এরকম কাজ করেছে বলে তাঁর জানা নেই। সামনে গহীন জঙ্গলে যেন অমাবস্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। দিনের বেলাতেই ঝিঁঝি ডাকছে। গাছগুলো পেল্লায় লম্বা, আর নীচে বড়ো বড়ো ঘাস, ফণীমনসা এবং হাজার রকমের আগাছার দুর্ভেদ্য জঙ্গল। লাল ঘুড়িটা যে এই জঙ্গলের কোথায় কোন গাছের মগডালে গিয়ে পড়েছে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। গণপতি খুব হতাশভাবে জঙ্গলটার দিকে চেয়ে রইলেন। ঘুড়ির আশা ত্যাগ করে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু গণপতি এতটা জলকাদা ভেঙে এসে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন। এখন একটু না জিরোলেই নয়। দ্বীপটার অনেক রকম বদনাম শুনেছেন, তবু শরীর আর দিচ্ছে না বলে সাহস করে তিনি ডাঙায় উঠলেন।

জলার জলে কাদা—মাখা পা ধুয়ে নিয়ে ভেলভেটের মতো নরম আর মোলায়েম ঘাসের ওপর বসলেন গণপতিবাবু। গা একটু ছমছম করছে ঠিকই। কিন্তু একটু দম না ফেলে উপায়ও নেই। চারদিকে বিস্তর পাখি ডাকছে। ঘুঘু, শালিখ, চড়াই, দোয়েল ছাড়াও বিস্তর পাখির অচেনা ডাক কানে আসছে। ফুলের গন্ধও পাচ্ছেন। ভয়—ভয় করা সত্ত্বেও বেশ ভালোই লাগছে তাঁর।

বসে একটু আলিস্যি ভর করল শরীরে। তিনি আধশোয়া হলেন। ঘুম—ঘুম পাচ্ছে খুব। কিন্তু এই অচেনা বিপজ্জনক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়াটা মোটেই কাজের কথা নয়। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। গায়ে চিমটি কাটলেন, হেঁড়ে গলায় গানও ধরলেন। কিন্তু কাজ হল না। রাজ্যের ঘুম যেন চোখে চেপে বসল। একটু বাদে নিজের অজান্তেই মখমলের মতো ঘাসের ওপর তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভারি অবাক হলেন গণপতিবাবু। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। কিন্তু চারদিকে একেবারে আলকাতরার মতো অন্ধকার। কোথায় আছেন তা কিছুক্ষণ বুঝতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই তাঁর শরীর শিউরে উঠল। ওরে বাবা! তিনি যে এখনও জলার ভিতরকার অলক্ষুণে দ্বীপটার মধ্যে বসে আছেন! ফিরবেন কী করে? দু—চোখে যে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না।

হঠাৎ কাছেই কে যেন খুক করে একটু হেসে উঠল।

গণপতি প্রবল আতঙ্কে বাজখাঁই গলায় বললেন, কে রে? ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।

আর কোনো শব্দ নেই। গণপতিবাবুর গায়ের লোম ভয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা লাল ঘুড়ির পাল্লায় পড়ে এবার প্রাণটা না যায়। তিনি তাড়াতাড়ি জলায় নেমে পড়ার জন্য বসা অবস্থাতেই পিছলে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পিছন থেকে কে যেন মোলায়েম গলায় বলে উঠল, মঙ্গলপুরের জলা যে এখান থেকে দূর হে বাপু!

কে? কে কথা বলছে রে?

বন্ধুও ভাবতে পারো, শত্রুও ভাবতে পারো, সে তোমার ইচ্ছে।

আ—আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ভূ—ভূত নাকি?

ভূত! তাই বা খারাপ কী?

আমি কোথায় আছি?

এ ভালো জায়গা।

কিন্তু আমি যে বাড়ি যাবো।

তাড়া কীসের? এটাই বাড়ি ভেবে নাও না।

বাড়ি! এটা বাড়ি হতে যাবে কেন? এ তো জঙ্গল। মঙ্গলপুরের—

না হে বাপু, বললুম না মঙ্গলপুরের জলা থেকে তুমি দূরে এসে পড়েছো!

কত দূর?

বেশি নয়। মাত্র দু—হাজার দুশো কুড়ি কোটি আলোক বছর।

যাঃ, কী যে বলেন! এখন এই খিদের মুখে ইয়ার্কি ভালো লাগে না। বরং একটা আলো—টালো জ্বালুন।

জ্বালছি বাপু। তবে যা বললুম তা নির্যস সত্যি কথা। তুমি একটু দূরেই এসে পড়েছো কিন্তু।

ফস করে একটা অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠল। একেবারে দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল চারদিক। গণপতি দেখতে পেলেন, তিনি একটা কাচের ঘরে বসে আছেন। ঘরটা ঝকঝকে তকতকে। মেঝেতে পুরু গালিচা। চারদিকে নানারকম বিচিত্র সব আসবাব। কাচের ওপাশে দেখা যাচ্ছে, বহু নীচে অনেক বড়ো বড়ো বাড়িঘর, উঁচু দিয়ে ফ্লাইওভারের মতো রাস্তা কোথা থেকে যে কোথায় চলে গেছে। আকাশে নানা আকৃতির সব জিনিস ভাসছে। কোনোটা নৌকার মতো, কোনোটা বাটির মতো, কোনোটা চুরুটের মতো। সেগুলো এদিক—ওদিক যাতায়োত করছে।

আর সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সি একটা লোক ফিকফিক করে হাসছে।

গণপতি বললেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

না হে বাপু, স্বপ্ন নয়। আমাদের এই গ্রহের নাম আঁধারমানিক।

আপনি বাংলায় কথা বলছেন যে!

তা আর কোন ভাষা বলব? আমাদের ভাষাই যে বাংলা।

বটে। আমি স্বপ্ন দেখছি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বলুন এখানে আমাকে আনলেন কী করে?

সে বিজ্ঞানের অনেক কলকাঠি আছে। তুমি বুঝবে না।

কিন্তু আনলেন কেন?

আমার কাজই হল মাঝে মাঝে পৃথিবীতে গিয়ে এক—আধটা বাঙালিকে ধরে নিয়ে আসা।

সে কী! কেন?

তার কারণ, পৃথিবীরা বাঙালিরা ভারি অলস, কুচুটে, মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বাজে কাজে সময় নষ্ট করে, রাজনীতি আর তর্ক—ঝগড়া করে আয়ুক্ষয় করে। পৃথিবীর বাঙালিদের এনে কিছু তালিম দিয়ে তাদের আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা।

কিন্তু আমি যে একজন রিটায়ার্ড বুড়ো। আমার কি আর তালিম নেওয়ার বয়স আছে?

ওই তো তোমাদের দোষ। নিজেকে বুড়ো বা অকর্মণ্য ভাবার জন্যই তোমরা অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছো। তোমার যা বয়স তাতে আমাদের হিসেবে তুমি আরও বিশ বছর বাঁচবে। আর এই বিশ বছরে তোমার কর্মক্ষমতা অনুযায়ী পৃথিবীর একশো মানুষের একশো বছর ধরে করা কাজ তুমি একাই করতে পারবে।

ওরে বাবা! অসম্ভব।

তুমি ঘুড়ির পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করছিলে দেখেই তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি। আজই তোমাকে তালিম দেওয়া শুরু হবে। তৈরি থাকো।

গণপতিবাবু ভয়ে শুকিয়ে গেলেন। দিব্যি আলসেমি করে সময় কাটছিল, হঠাৎ এসব কী?

লোকটা তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দিব্যি বাঙালি রান্না ডাল, ভাত, তরকারি, পায়েস, রসগোল্লা দিয়ে ভূরিভোজ করিয়ে একটা ডিঙি নৌকোর মতো যানে উঠিয়ে লোকটা তাঁকে নিয়ে বেরোলো। যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান গণপতি। বিশাল গ্রহ জুড়ে আশ্চর্য সব যানবাহন, আশ্চর্য ঘরবাড়ি, বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি। গাছপালা নদী—নালা পাহাড়—উপত্যকা মিলিয়ে সৌন্দর্যও অসামান্য।

আপনার নামটি কী?

ভোলানাথ বসু।

বাঃ, এ তো বাঙালি নাম।

বললুম না, আমরা এ গ্রহের লোক সবাই বাঙালি। তবে তোমাদের মতো অপদার্থ নাই। আমরা কাজের মানুষ। এখানে আমরা একদণ্ড সময় নষ্ট করি না। ঘড়ি ধরে চল, ঘুড়ি ধরে সময় নষ্ট করি না।

গণপতি একটু লজ্জা পেলেন।

একটা ভাসমান বাড়ির গায়ে নৌকোটা ঠেকিয়ে ভোলানাথ বলল, এবার এসো। তোমাকে বিজ্ঞানের তালিম দেওয়া হবে।

গণপতিবাবু এই আশ্চর্য ভাসমান বাড়িতে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ল্যাবরেটরি। একটা ঘরে ক্লাশ হচ্ছে। সেই ক্লাসে অনেক ছাত্র বসে আছে। তার মধ্যে দু—জনকে দেখে গণপতি অবাক। একজন তাঁদের গ্রামেরই নাকুসার ঘোষ, যে বছরটাক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অন্যজন গোকুল বিশ্বাস, যে কিনা মঙ্গলপুরের জলায় মাছ ধরতে গিয়ে পাঁকে তলিয়ে গিয়েছিল বলে লোকে জানে।

গোকুল বিশ্বাসের পাশেই তাঁকে বসানো হল। একজন ছোকরামতো অধ্যাপক ব্ল্যাকবোর্ডে কী সব আঁকিবুকি করে কী যেন বোঝাচ্ছে।

গোকুল চাপা গলায় বলল, বাঁচতে চাও তো পালাও। এরা দিন—রাত খাটাতে খাটাতে জান কয়লা করে দিচ্ছে। খটোমটো সব জিনিস বোঝাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারি না।

পালাবো কী করে?

তা জানি না। কিন্তু না পালালে মারা পড়ব। এত কাজ জীবনে করিনি। ক্লাসের পর চাষের খেতে নিয়ে যাবে, তারপর কারখানায় নিয়ে যাবে, তারপর হাসপাতালে যেতে হবে, তারপর কবিতার ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস, গানের ক্লাস, জিমন্যাসিয়াম, সাঁতার, বক্সিং, ক্রিকেট, দাবা ....

বলো কী?
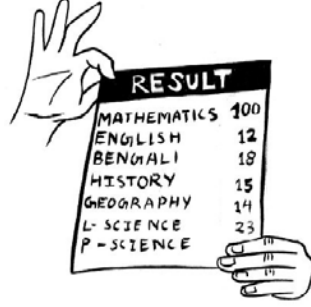
আরও আছে।

গণপতিবাবু সভয়ে উঠে পড়লেন। তারপর এক দৌড়ে করিডোর পেরিয়ে সোজা ডিঙি নৌকোটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ডিঙি নৌকোটা পট করে সরে যাওয়ায় শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে নীচে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

চমকে যখন উঠে বসলেন তখন চেয়ে দেখেন, বেলা পড়ে এসেছে। তিনি কাঠুরেডাঙ্গার জঙ্গলের ধারেই রয়েছেন।

বাপ রে! জোর বেঁচে গেছি! বলে লাফ দিয়ে জলে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে লাগলেন গণপতি। না, আর জীবনেও ঘুড়ি ধরতে যাবেন না তিনি।

দীপুর অঙ্ক

অঙ্কে দীপুর মাথা খুব ভালো বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে সে একেবারে ন্যাদোস। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় সে ইংরিজিতে পেয়েছে বারো, বাংলায় আঠেরো, ইতিহাসে পনেরো এইরকম সব আর কী। মোট পাঁচ বিষয়ে ফেল। তবে অঙ্কে একশোতে একশো। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে এই ক্লাস টেন অবধি অঙ্কের নম্বরে কোনো নড়চড় নেই, সেই একশোতে একশো। অনেক চেষ্টা করেও অঙ্কের স্যার কোনোদিন তার এক নম্বরও কাটতে পারেননি।

কথা হল পাঁচ বিষয়ে ফেল করে সে নতুন ক্লাসে ফি বছর ওঠে কী করে? আসলে স্কুলের হেডস্যার বলেন, দীপুর অঙ্কের মাথা যখন এত ভালো তখন সে তো আর গবেট নয়। অন্য বিষয়ে মন দিলে পাশ নম্বর পাবে। মন দেয় না এই যা।

তাই প্রতি বছর স্পেশাল কনসিডারেশনে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাস টেন—এ ওঠার পর সমস্যা দেখা দিল।

হেডস্যার তাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ দীপু, এত দিন তোকে স্পেশাল কনসিডারেশনে প্রমোশন দিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এরপর তো তোকে বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হবে। তখন তোকে কেউ খাতির করবে না। কাজেই মন দিয়ে অন্য বিষয়গুলো পড়। টেস্টে এক বিষয়ে ফেল হলেও কিন্তু অ্যালাউ করা যাবে না। মনে থাকে যেন।

দীপু পড়ল অগাধ জলে। দুনিয়াতে অঙ্ক ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। অন্য কিছু তার ভালোও লাগে না। তবে অঙ্কে তার মাথা এমনই খোলতাই যে স্কুলের অঙ্ক তো দূরস্থান বি এসসি এম এসসি ক্লাসের অঙ্ক বইও তার কাছে জলভাতের মতো লাগে। যেকোনো অঙ্ক— তা যে যত শক্তই হোক— দীপু দেখলেই অঙ্কটা কী চাইছে, কোন পদ্ধতিতে এগোবে এবং শেষে কোথায় পৌঁছোবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। অঙ্কেরা যেন দীপুর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যই বসে আছে। কিন্তু অন্য বিষয়ের বইপত্র খুলে বসলেই যেন দীপুর গায়ে জ্বর আসে। ইংরিজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস বড়োই বিস্বাদ লাগে তার। বাংলা বই খুললেই যেন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ঢাল—তরোয়াল নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে। ইংরিজি বই খুললেই যেন বইয়ের পাতা থেকে গোলাগুলি ছুটে আসতে থাকে। ইতিহাস খুললেই যেন একদল ডাকাত 'রে রে' করে ওঠে। ভূগোল বই খুললেই মনে হয় ম্যাপ আর অক্ষরগুলো তাকে নিয়ে হাসাহাসি আর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে আর দুয়ো দিচ্ছে।

অথচ পাশ না করলেই নয়। তার গরিব বাপ সাত মাইল দূরের গঞ্জে একটা গুদামে সামান্য হিসেব রাখার চাকরি করে। বড়োই টানাটানির সংসার। দীপুর আরও দুটো বোন আর দুটো ভাই আছে। দীপু পাশ—টাশ

করে চাকরি পাবে এই আশায় তার পরিবারটা বসে আছে। তার ওপর সকলের ভরসার একটাই কারণ যে সে অঙ্কের ভালো ছাত্র।

কিন্তু শুধু অঙ্ক জানলেই যে হবে না তা দীপুর মতো হাড়ে হাড়ে আর কে জানে? মাস্টার রাখার সাধ্য তার নেই, তাই সে মাস্টারমশাইদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইংরিজি, বাংলা ইত্যাদিতে তালিম নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজ বিশেষ এগোলো না। বাংলার স্যার বঙ্কুবাবু একদিন তাকে বললেন, ওরে দীপু, তোর মাথা হল অঙ্কময়। অঙ্ক ছাড়া তোর যে আর কিছুই সয় না। রবীন্দ্রনাথের অত ভালো কবিতাটা মুখস্থ করতে দিলুম, আর তাতে কিনা তোর সর্দি ধরে গেল!

ইংরিজির স্যার নরেনবাবু বললেন, তোর মাথার ভিতরটায় অঙ্কের একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে। ওই জঙ্গলে কি আর ইংরিজি সেঁধোতে পারে রে? খানিকটা অঙ্ক মুড়িয়ে কেটে তবে ঢোকার রাস্তা করতে হবে। কিন্তু সে তো হওয়ার নয়।

ইতিহাসের স্যার নন্দবাবু বা ভূগোলের স্যার পাঁচুবাবুও বিশেষ আশা দিতে পারলেন না। শুধু বলে দিলেন, মাথার অঙ্কের ভাবটা না কমালে অন্য সব বিষয়ের সেখানে জায়গা হচ্ছে না।

দীপু ভারি দমে গেল। এতকাল অঙ্কই ছিল তার বন্ধু। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল অঙ্কের মতের এমন শত্রু তার আর কেউ নেই। রাগ করে দিন দশেক সে অঙ্কের বই ছুঁল না, একটাও অঙ্ক করল না। তাতে তার মাথা ধরল, আইঢাই হতে লাগল, খিদে কমে গেল, অনিদ্রা হতে লাগল। তবু সে দশ দিন অঙ্কহীন কাটিয়ে দিল। কিন্তু অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হল না, দশদিন বাদে যখন ফের অঙ্ক কষতে বসল তখন তার মাথা থেকে অবরুদ্ধ অঙ্কের স্রোত বাঁধভাঙা বন্যার মতো বেরিয়ে এল। ভারী আনন্দ হল তার, ভারী ভালো লাগতে লাগল। নাঃ, অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। সে মাথায় অঙ্ক নিয়েই জন্মেছে, একে মাথা থেকে তাড়াবে কী করে?

কিন্তু কথা হল, মাথার মধ্যে অঙ্ক গিজগিজ করছে বলে অন্য বিষয়গুলো ঢুকতেও চাইছে না। ইতিহাসের স্যার মৃগাঙ্কবাবুও বলছিলেন, বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল একটা গুণ্ডা সাবজেক্ট, যেমন ষণ্ডা তেমনি রাগী জিনিস। ইতিহাস হল দুর্বল, ভীতু জিনিস। তোর মাথায় অঙ্কের দাপাদাপি দেখে ভয়ে ভীতু ইতিহাস ঢুকতেই চাইছে না।

ভূগোলের অন্য স্যার রমেশবাবু তাকে ভূগোল শেখানোর চেষ্টা করে অবশেষে একদিন ক্ষ্যামা দিয়ে বললেন, তোকে কথাটা বলি—বলি করেও এতদিন বলিনি। বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল আসলে এক ধরনের ভূত। ও যার ঘাড়ে চাপে তার আর নিস্তার নেই। ওঝা—বদ্যি ডেকেও লাভ হয় না। আমার সোজা মামার কথাই ধর না, দিব্যি খেয়ে—দেয়ে ফুর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিন অঙ্কের বাই চাপল। চাপল তো চাপলই। নাওয়া—খাওয়া ভুলে গেলেন, কাছাকোছার ঠিক নেই, ধান শুনতে কান শোনেন। শেষে পাগলাগারদে দেওয়ার জোগাড়। শেষে অঙ্ক কষে কষেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

ভূত হোক, গুণ্ডা হোক, অঙ্কের জন্যই যে তার বেশ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারছে দীপু, কিন্তু অঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণই বা কোথায়? ভেবে ভেবে সে রোগা হয়ে যেতে লাগলে।

কপালটাই খারাপ। টেস্ট পরীক্ষায় পাঁচ বিষয়ে ডাব্বা মারল সে, শুধু অঙ্কে কোনো নড়চড় হল না, সেই একশোতে একশো।

হেডস্যার ডেকে দুঃখ করে বললেন, এবারটা আর মাধ্যমিক দেওয়া হল না তোর। এক বছর ভালো করে পড়, এর পরের বার দিস।

চোখ ফেটে জল এল দীপুর। বাবা বলে রেখেছে টেস্টে অ্যালাউ হতে না পারলে জোতজমির কাজে লাগিয়ে দেবে। সেই ভালো, চাষবাস করতে করতে মাথা মোটা হয়ে যাবে তার। অঙ্কেও ভাটা পড়বে।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দীপু নীলকুঠির নির্জন পোড়ো জমিতে একটা গাছজলায় এসে চুপচাপ বসে রইল। মনটা বড়োই খারাপ। তার লেখাপড়া তাহলে এখানেই শেষ!

শীতের বেলা পড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। দীপুর তবু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না, বসে বসে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় কাছেপিঠে মানুষের গলা শুনতে পেল দীপু। চাষি—বাসি বা রাখাল ছেলেরাই হবে। প্রথমটায় অত খেয়াল করেনি। একটু বাদেই মনে হল কথাগুলো খুব কাছেই কারা যেন বলাবলি করছে। কিন্তু ভাষাটা যেন কেমনতরো, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীপু চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। চারদিকে ঘর ঝোপঝাড়, তার ওপর শীতের বেলা ফুরিয়ে অন্ধকারও হয়ে এসেছে অনেকটা।

দীপু একটু অবাক হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। দীপু জানে নীলকুঠিতে পুরোনো সব সাহেব ভূত আছে। সেই ভয়ে রাতবিরেতে এদিকে কেউ আসেন না। তারও একটু ভয়—ভয় করছিল। তবে মন খারাপ বলে ভয়টা তেমন বেশি হল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও দীপু থমকে গেল।

তার সামনে পথ আটকে তিনজন লোক দাঁড়ানো। তিনজনের চেহারাই একরকম এবং অদ্ভুত। বেঁটে, পেটমোটা, মাথায় টাক। তিনজনেরই পরনে হেঁটো ধুতি আর ফতুয়ার মতো জামা, দেখলে মনে হয় সার্কাসের বামনবীর জোকার।

দীপু ভারি অবাক হয়ে তিনজনকে দেখছিল।

তিনজনের মাঝখানের জন একটু এগিয়ে এসে নিজের টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ওহে বাপু, আমরা একটু বিপাকে পড়েছি, সাহায্য করতে পারো?

দীপু ঢোঁক গিলে বলল, কীরকম সাহায্য?

লোকটা ফস করে একটা কাগজ আর পেনসিল বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো বাপু, অঙ্কটা কষতে পারো কিনা।

দীপু অঙ্ক দেখলেই পাগল হয়। সে আর দ্বিরুক্তি না করে কাগজটা নিয়ে খসখস করে অঙ্কটা কষতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে কাগজটা ফেরত দিয়ে বলল, এই নিন, হয়ে গেছে।

লোকটা বাঁ—হাতে কাগজটা নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার চেয়ে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না হে বীজদত্ত, সাংখ্যদত্ত, ছোকরার এলেম আছে।

বাকি দু—জন একটু মুখ তাকাতাকি করল।

মাঝখানের জন দীপুর দিকে চেয়ে বলল, বুঝলে ছোকরা, জগতে অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নেই। অঙ্কময়ং জগৎ, দুনিয়াটা চলছেই তো অঙ্কের জোরে। গান বলো, কবিতা বলো, সাহিত্য বলো সবকিছুর পিছনেই দেখবে অঙ্ক ঠিক ঘাপটি মেরে আছে। এই যে ফুল ফোটে, জ্যোৎস্না ওঠে, মলয় পবন বয়ে যায়, একটু চেপে যদি ভেবে দেখ তাহলে দেখবে তার পিছনেও ওই অঙ্কেরই খেলা। তা শুনলুম তোমার নাকি অঙ্ক নিয়ে কীসব সমস্যা হচ্ছে। সত্যি নাকি?

দীপুর চোখে জল এল, সে ধরা গলায় গলল, আপনারা কি অন্তর্যামী?

লোকটা শহব্যস্তে বলে ওঠে আহা, চোখের জল ফেরার কী হল হে ছোকরা? তা বাপু, অন্তর্যামী আমরা বটে। আমার নাম হল ঘণক। আমি হলুম গে জ্যামিতি, ত্রিকোণোমিতি আর ঘণকের দেবতা। আমার নাম ঘণকদত্ত। আর ওই যে বাঁ—দিকেরটি উনি হচ্ছেন বীজগণিত আর কল্প অঙ্কের দেবতা। বীজদত্ত। আর ডানদিকেরটি সংখ্যাবিদ সাংখ্যদত্ত।

দীপু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, আপনারা দেবতা নাকি? কই, এরকম নাম তো শুনিনি!

লোকটা টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে ক—জনের নাম জানো হে ছোকরা? যদি চেপে ধরি তাহলে তেত্রিশ জনের নামও কি বলতে পারবে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, আজ্ঞে না।

তাহলে!

দীপু আমতা আমতা করে বলে, আমি শুনেছিলুম লেখাপড়ার দেবতা হলেন মা সরস্বতী।

তা তো বটেই। কিন্তু লেখাপড়া তো আর চাট্টিখানি জিনিস নয়। বিশাল সমুদ্দুর। মা সরস্বতীর অধীনে এই আমরাই নানা শাখা—প্রশাখা আগলাই। তা ধরো কয়েক হাজার তো হবেই। কেউ ছন্দ সামলায় তো কেউ অলংকার, কেউ কাব্য সামলায় তো কেউ গদ্য। গদ্যেরও আবার কত ভাগ, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। তারপর ধরো ইতিহাস, ভূগোলের পিছনেও মেলা দেবতাকে মেহনত দিতে হচ্ছে। বিশাল কর্মযজ্ঞ হে, বিশাল কর্মযজ্ঞ। তা ওসব কথা থাক, তোমার সমস্যাটা কী হচ্ছে বলো তো!

দীপু ম্লানমুখে বলল, অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই যে আমি বছর বছর ফেল করি!

লোকটা সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, ওহে সাংখ্যদত্ত, বীজদত্ত, কী বুঝছো?

সঙ্গী দু—জন মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে প্রায় একসঙ্গেই বলল, অসম্ভব!

ঘণক দীপুর দিকে ফিরে একগাল হেসে বলল, শুনলে তো! জগৎটাই অঙ্কময়। যে অঙ্ক জানে সে তো কেল্লা মেরেই দিয়েছে!

তাহলে আমি ফেল করি কেন?

ঘণক মাথা চুলকে বলে, কেন ফেল করো তার কারণটা খুব জটিল, বললেও তুমি বুঝবে না। শুধু এটুকু বলি, তোমার মাথাটা একটা ঘর। তুমি সেই ঘরের মধ্যে দরজা—জানালা এঁটে অঙ্ককে কয়েদ করে রেখেছো। কুনকে হাতি কাকে বলে জানো?

আজ্ঞে না।

কুনকে হাতি হল এক ধরনের পোষা হাতি, যারা জঙ্গলের বুনো হাতিকে ভুলিয়ে—ভালিয়ে নিয়ে আসে, তারপর হাতি মানুষের ফাঁদে ধরা পড়ে।

আজ্ঞে বুঝলাম।

কিছুই বোঝোনি। অঙ্ক হল তোমার কুনকে হাতি, তাকে আটক রাখলে তো চলবে না। তাকে ছেড়ে দাও। অঙ্কই গিয়ে ইংরিজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলকে ধরে আনবে।

দীপু অবাক হয়ে বলে, কী করে?

ওই যে বললুম, অঙ্কময়ং জগৎ, সব কিছুই মধ্যেই যে চোরা অঙ্ক রয়েছে সেটাই তুমি ধরতে পারোনি। ওই অঙ্ক দিয়েই সব কিছু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলেই দেখবে কেল্লা ফতে।

দীপু হাঁ করে রইল।

ঘণক বলল, আমরা তোমাকে বর দিতে এসেছি। বর মানে জানো?

একটু একটু জানি।

ছাই জানো। বর মানে বরণ করা। যা পেতে হবে, যা পেতে চাও তার জন্য সব কষ্টকে বরণ করে নেওয়াই হচ্ছে বর লাভ। বুঝলে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

তা কষ্টটা কি করবে?

যে আজ্ঞে।

তথাস্তু। বলে তিন বেঁটে দেবতা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপু চমকে উঠে বুঝতে পারল, সে গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু স্বপ্নটাকে খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হল না তার। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দীপু উঠে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের বছর টেস্ট পরীক্ষায় দীপুর নম্বর হল বাংলায় আশি, ইংরিজিতে বিরাশি, ভূগোলে নব্বই, ইতিহাসে পঁচাত্তর, অঙ্কে সেই একশোতে একশো।

না, দীপুর আর অঙ্কের ওপর অভিমান নেই।

গর্ভনগরের কথা

লিফটের দরজার কাছে এক বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একা। লিফটের দরজা খোলাই রয়েছে। ওপরে যাওয়ার যাত্রী আজকাল আর নেই। কিন্তু সীমন্তককে যেতেই হবে। ওপরেই তার কাজ।

আজ সকাল থেকে সীমন্তক খুশিই রয়েছে। খুশি হওয়া খুব বিচিত্র নয়। কারণ আজ সকালের রেশনেই সে পেয়েছে আধঝুড়ি পালং শাক আর দু—মুঠো কড়াইশুঁটি। কী সবুজ! কী সবুজ! কৃত্রিম খাবার আর ভিটামিন আর ধাতব ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে জিভ অসাড়। বহুকাল পরে সে আজ সবজে টাটকা তরকারি খেল। কড়াইশুঁটির খোসাগুলোও সে ফেলে দেয়নি, পালং শাকের শেকড়টুকুও।

খোশমেজাজে লিফটে উঠবার মুখে সে বৃদ্ধের করুণ চাউনি দেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল— ওপরে যাবেন নাকি?

—নেবেন?

সীমন্তক মাথা নাড়ল— আসুন।

বুড়োকে চেনে সীমন্তক। প্রায়ই এখানে সেখানে দেখা হয়। বয়স বোধহয় দুশো পঁচাত্তর বছর। আসলে এইসব বুড়ো মানুষেরা হল প্রদর্শনীর বস্তু। মানুষের বিজ্ঞান কত দূর কী করতে পারে এ হচ্ছে তারই কে উদাহরণ। যে ক—জন এরকম প্রবৃদ্ধ রয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির অনেক অদল—বদল ঘটে গেছে। কারও বুকে অন্যের হৃদযন্ত্র, কারও ফুসফুস কৃত্রিম, কারও পাকস্থলী কেটে বাদ দিয়ে কৃত্রিম পাকযন্ত্র বসানো হয়েছে, কারও ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে মস্তিষ্ক। আর এইভাবেই এঁদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তবে বেশিরভাগেরই স্মৃতি ধূসর, বোধ বা বুদ্ধি খুবই ক্ষীণ, আচরণ অনির্দিষ্ট। সীমন্তক এঁদের এড়িয়েই চলে। কিন্তু আজ সে বড়ো খোশমেজাজে আছে, তাই বৃদ্ধকে উপেক্ষা করল না!

বুড়ো লোকটি লিফটে উঠে চারদিকে সভয়ে চেয়ে দেখছেন। মস্ত এক ঘরের মতো এই লিফটে নানারকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগানো। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই লিফট চালানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

সীমন্তক বিশেষজ্ঞ। সে নানারকম চাবি টিপে, হাতল ঘুরিয়ে লিফট চালু করে এবং গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। এক সময়ে আনমনে বলে ওপরে তো বরফ ছাড়া আর কিছু নেই, তবু কী দেখতে যান বলুন তো!

বৃদ্ধ খুবই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন— কিছু না। মাটির নীচে থাকতে ভালো লাগে না তো, তাই।

—মাটির নীচটা কি খারাপ?

—আকাশ দেখা যায় না তো।

—ওপরেও কি আকাশ দেখা যায়?

—তা নয়। তবে ওই আর কী। কিছুটা ফাঁকা তো দেখা যায়।

সীমন্তক এসব ভাবপ্রবণতার মানে বোঝে না। পৃথিবীর ওপরে এক সময়ে জনবসতি ছিল এতো জানা কথা। কিন্তু মাটির নীচের জনবসতি তার চেয়ে এক বিন্দু খারাপ কী? সীমন্তক অবশ্য জন্মেছেই মাটির নীচে; তাই তার কাছে আকাশ বা ফাঁকা জায়গা দেখার কোনো আকর্ষণ নেই।

লিফট উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন চেক পোস্টে থামছে। পৃথিবীর ওপরে প্রতি মুহূর্তে পুরু হয়ে উঠছে বরফের আস্তরণ। তাই প্রতি মুহূর্তের খবর লিফটের যাত্রাপথে সংগ্রহ করে নিতে হয়। পৃথিবীর মাটির মাত্র একশো থেকে দেড়শো ফুট নীচে এখানকার জনবসতি। কিন্তু মাটির ওপর আরও দুশো তিনশো চারশো বা তারও বেশি ফুট বরফ জমে আছে। শূন্যের বহু বহু ডিগ্রি নীচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক— যা অ্যালকোহল ব্যারোমিটারেও মাপা সম্ভব নয়। মৃত, সাদা অবিরল তুষার ঝটিকায় আক্রান্ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তবু সংযোগ রাখতে হয় গর্ভনগরগুলোর। কারণ সংগ্রহ করতে হয় শ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস জল বিদ্যুৎ। বহুদূর মহাকাশে পৃথিবীর চারদিককার বিমর্ষ প্রায়ান্ধকার তুষারমণ্ডলের বাইরে পরিক্রমারত রয়েছে মানুষের সৃষ্ট অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ— সেগুলোর সঙ্গেও অব্যাহত রাখতে হয় যোগাযোগ। তাই পৃথিবীর উপরিভাগে মানুষ বরফ ভেদ করে তৈরি করেছে বহু সংখ্যক বুদবুদ। নামে বুদবুদ, দেখতেও তাই। এসকিমোদের ঘর ইগলু যেমন দেখতে ছিল অবিকল সেইরকম। তবে বরফ দিয়ে তৈরি নয়, এগুলো তৈরি হয়েছে মানুষের সৃষ্ট সবচেয়ে ঘাতসহ তাপসহ অসম্ভব শক্তিশালী পলিথিন দিয়ে। বুদবুদগুলো প্রতিদিনই বরফে ঢাকা পড়ে যায়, প্রতিদিনই সেগুলোকে ঠেলে আরও উঁচুতে তুলে দিতে হয় নীচে থেকে চাপ দিয়ে।

এইরকম একটি বুদবুদেই কাজ করতে হয় সীমন্তককে। প্রতিদিন সে বুদবুদে বসে মৃত তুষার যুগের সাদা পৃথিবীর দৃশ্য দেখে। প্রতিদিন তাকে মাটির ওপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উপরিভাগের বরফের চাপের হিসেব নিতে হয়, ভূকম্পন তুষার স্তরের ঘর্ষণজনিত দুর্বিপাক ও আবহাওয়ার প্রতি মুহূর্তের মতিগতির দিকে নজর রাখতে হয়। কোনোদিন যদি বরফের চাপে, গর্ভনগরের ছাদ ধসে যায় তবে মানুষের সর্বনাশ। তুষার যুগের শৈত্য সহ্য করা যে—কোনো প্রাণীরই সাধ্যাতীত। একটা দীর্ঘ শ্যাফটের ভিতর দিয়ে লিফট ধীরগতিতে উঠছে। সর্বশেষ চেক পোস্টে থামে সীমন্তক। দরজা খোলে। সামনে ছোট্ট একটা ইস্পাতের তৈরি ঘরে নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হাসিখুশি ছেলে বসে আছে। সে মাথা নেড়ে বলল— আমাদের বাবলটায় হয়তো কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। বড্ড বেশি বরফ পড়েছে দু—দিন। আর বেশি ঠেলে তোলা যাবে না।

সীমন্তক ভ্রূ কুঁচকে ফিরে আসে। চেক পোস্ট থেকে ছেলেটি তাকে সবুজ বাতি দেখায়।

বুড়ো লোকটি এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। একটি টুলের ওপর চুপ করে বসে আছেন।

শেষ পর্যায়ে লিফট খুব ধীরে ধীরে চলে। এখানে শ্যাফট বা লিফটের সুড়ঙ্গ পথটি টেলিস্কোপিক। অর্থাৎ তা ইচ্ছে করলে জিরাফের মতো গলা লম্বা করতে পারে। তবে সে ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। শেষ পর্যায়ে পুরোটাই গভীর কঠিন বরফের ভিতর দিয়ে যাওয়া। লিফটের ভিতরটা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত। তবু গর্ভনগরের তুলনায় এখানে যেন একটু শীত বেশি, নীরবতা বেশি।

লিফট থামলে সীমন্তক দরজা খোলে।

বিশাল আয়তনের ঘরখানা সাদা আলোয় ভরে আছে।

গর্ভনগরের জীবনে সকাল বিকাল বা রাত্রি বলে কিছু নেই। সেখানে সব সময়ে কৃত্রিম আলোর জগৎ, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নেই, তারাভরা আকাশের দিকে তাকানোর উপায় নেই।

সাদা আলোয় ভরা বুদবুদের ভিতরে পা রেখেই নাক কুঁচকে যায় সীমন্তকের। প্রাকৃতিক আলো তার সহ্য হয় না। জন্মাবধি সে বড়ো হয়েছে কৃত্রিম আলোর মধ্যে।

আজ মেঘলা আকাশ ভেদ করে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি দেখা দিয়েছে। চারদিককার লক্ষ কোটি বরফের স্ফটিকে সেই আলো চতুর্গুণ তেজে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাইরের দিকে চোখ রাখা দুষ্কর।

সীমন্তক কর্মরত আর একজন লোককে ছুটি দিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বসে গেল। মহাকাশে অনেকগুলো মস্ত মস্ত উপগ্রহ আছে, যাদের বলা হয় স্বর্গনগর। কোনো কোনোটার দৈর্ঘ্য এক মাইল দেড় মাইল। পাশ বালিশের মতো চেহারার এইসব উপগ্রহের ব্যাসও কয়েক হাজার ফুটের মতো। কয়েক সহস্র লোক স্থায়িভাবে এগুলিতে বসবাস করছে। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে চাষবাস, চিকিৎসা, মেরামতের কাজ সবই হয়। সন্তান জন্মায়, বড়ো হয়। সীমন্তকের কাজ এইসব কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। কাজ করতে করতে সীমন্তক বুড়ো লোকটির কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, বুদবুদের সুদূর একটি কোণে স্বচ্ছ দেয়ালে শরীর সিঁটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বাইরের দিকে নিথরভাবে চেয়ে আছেন।

মহাকাশ থেকে নতুন কোনো খবর নেই। শুধু জানা গেল ওপর থেকে তারা পৃথিবীর দিকে অবিরল নজর রেখে চলেছে। দক্ষিণ মেরুর দিকে গত কয়েকদিন তুষারপাত খুবই কম হয়েছে।

সীমন্তক খোশমেজাজে উঠে বুড়ো লোকটির কাছাকাছি এসে বলল— কী দেখছেন?

বৃদ্ধ তাঁর বলিরেখাবহুল মুখখানা ফিরিয়ে তাকালেন। কিন্তু সীমন্তককে যেন চিনতে পারলেন না। বিড়বিড় করে বললেন— সূর্য উঠেছে!

সীমন্তক হাসল। সূর্যের প্রতি তার নিজের কোনো দুর্বলতা নেই। বলল— মাঝে মাঝে ওঠে। কিন্তু ওদিকে অত চেয়ে থাকবেন না। চোখের ক্ষতি হতে পারে।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন— চোখের ক্ষতি আর কী হবে। আমার পুরোনো চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে সেই কবে! এটা হচ্ছে চতুর্থ চোখ। আবার না হয় পালটাবো। একটু দেখতে দাও।

এরা কী দেখে, কী মজাই না পায় তা সীমন্তক ভেবেও পায় না। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল— দেখুন না। তবে দেখার তো কিছু নেই। শুধু সাদা বরফ।

লোকটা আবার বাইএরর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বলল— সূর্য উঠেছে! বাইরে সূর্য উঠেছে। ওদের খবর দেবে না?

একটু ঝুঁকে সীমন্তক জিজ্ঞেস করে— কাকে খবর দেবো?

ওই যারা নীচে রয়েছে! খবর দাও। তারপর চলো আমরা রোদ্দুরে যাই।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বুড়োটার মগজ বদলের সময় এসেছে। বাইরে গিয়ে স্বাভাবিক বাতাসের একটি শ্বাসও বুক ভরে নিলে সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস জমে পাথর হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের মধ্যে জমে কাঠ হয়ে যাবে শরীর। তাই বাইরে যাওয়ার দরকার হলে সম্পূর্ণ বায়ু—নিরোধক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একরকমের পোশাক পরে যেতে হয়।

বুড়ো লোকটি উন্মুখ হয়ে সীমন্তকের দিকে চেয়ে বলল— আমি যখন খুব ছোটো তখন মাটির ওপর সবুজ গাছাপালা দেখেছি। তারপর হৈম হাওয়া আর তুষার আসতে লাগল। তখন পাতালে গর্ভনগর তৈরির কাজ করতেন আমার বাবা। যখন আমরা নীচে চলে গেলাম তখন খুব কেঁদেছিলাম আমি। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন— পৃথিবী আবার কয়েক বছরের মধ্যেই সবুজ হবে।

সীমন্তক এই বৃদ্ধের দুঃখকে সঠিক বোঝে না, তবু কিছু সমবেদনা বোধ করে সে বলে— পৃথিবী খুব শিগগির সবুজ হবে না।

—কেন?

সীমন্তক ম্লান হেসে বলে— যত বরফ জমে আছে পৃথিবীর ওপর তা গলতে বহু বছর লেগে যাবে। তারপর বরফ গলে নেমে আসবে মহা প্লাবন। ওপরের সমস্ত ভৌগোলিক সীমারেখা মুছে যাবে সেই প্লাবনে।

জল সরতে লাগবে আরও বহু বহু বছর। সবুজ আসবে তারও বহু পরে।

—অরণ্য তৈরি হবে না, গাছে গাছে পাখি ডাকবে না, ফুলে ফুলে পতঙ্গের ওড়ার শব্দ শুনব না কেউ ততদিন? আমাদের সকালের সূর্যোদয়, বিকেলের বিষণ্ণতা, রাত্রির নিস্তব্ধতা বলে কিছু থাকবে না ততদিন?

বুড়ো মানুষেরা শিশুর মতোই। সীমন্তক তাই ছেলে—ভুলানো স্বরে বলে— চিন্তা কী? আমাদের গর্ভনগরের পক্ষী নিবাসে যথেষ্ট পাখি রয়েছে, আমরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটির নীচে অরণ্য না হোক যথেষ্ট গাছাপালা তৈরি করেছি, পতঙ্গেরও অভাব নেই আমাদের কীট প্রজনন ক্ষেত্রে।

বিস্বাদে ভরে গেল বৃদ্ধের চাউনি। মাথা নত করে বলল— তোমরা কেন লেজার রশ্মি এবং বিস্ফোরণের সাহায্যে সব বরফ গলিয়ে ফেলছো না?

—লাভ কী? শূন্যের বহু বহু নীচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক। বরফ গলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার তা জমাট বাঁধবে।

—কেন কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টি করছ না?

সীমন্তক বৃদ্ধের পিঠে হাত রেখে বলে— আমরা সে চেষ্টাও করছি। কিন্তু কৃত্রিম সূর্যেরও সাধ্য নেই পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপ ফিরিয়ে আনার।

বৃদ্ধ কথা বললেন না। বাইরের স্তিমিত সূর্যরশ্মির দিকে চেয়ে রইলেন। ঝোড়ো হাওয়ায় গুঁড়ো বরফ বালির মতো উড়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বরফের স্তম্ভ, খিলান, গম্বুজ, আবার আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছে সব।

বেতার যন্ত্রে মহাকাশের বার্তা আসছে। সীমন্তক তার টেবিলে ফিরে গেল এবং বৃদ্ধের কথা তার আর মনে রইল না। বার্তা আসছে, মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে দক্ষিণ মেরুতে একটি জায়গায় সামান্য কিছু বরফ গলে ছোট্ট একটু জলাশয় তৈরি হয়েছে। খবরটা অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। তবু সীমন্তক গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞদের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিল। দীর্ঘ টানেলে যুক্ত পৃথিবীর গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞরা কয়েক মিনিটেই দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছোতে পারবেন।

যখন সীমন্তক তার অত্যন্ত জরুরি বার্তাটি যথাস্থানে পৌছে দিতে ব্যস্ত তখন সেই বৃদ্ধ মানুষটি প্রাণপণে নিজেকে স্বচ্ছ কঠিন দেয়ালে চেপে ধরে নিবিড় নিস্পলক দৃষ্টিতে বাইরে চেয়েছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টির বিভ্রম ঘটল।

তিনি দেখতে পেলেন অফুরান তুষার—স্তূপের একঘেয়ে সাদা রঙের ভিতর থেকে হঠাৎ ছোট্ট রামধনু রঙা গিরগিটির মতো একটি প্রাণী বরফের স্তর ভেদ করে মাথা তুলল। কী একটু দেখল চারদিকে বিঘৎ খানেকের বেশি বড়ো নয়। তারপরই আবার টুক করে সরে গেল গর্তের মধ্যে। অবিশ্বাস্য! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! নিশ্চয়ই চোখের ভুল! বুড়ো লোকটি বিড়বিড় করে বলতে থাকেন— রোদ্দুর! গিরগিটি! রোদ্দুর! গিরগিটি! তবে কি অরণ্যও জেগেছে? সবুজ? পাখি?

বৃদ্ধ লোকটি চারদিক চেয়ে দেখেন বুদবুদের ভিতরে কর্মব্যস্ত কয়েকজন মানুষ তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কেউ তাঁকে দেখছে না।

বৃদ্ধ চুপিসারে বুদবুদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সুড়ঙ্গের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। একদম শক্ত করে আঁটা ভারী এই ধাতব দরজা। কিন্তু বৃদ্ধ দরজা খোলোর কৌশল জানেন। মাথার ওপরকার একটি হুইল ঘুরিয়ে তিনি দরজা ফাঁক করলেন এবং টুক করে নেমে পড়লেন সুড়ঙ্গে। পথ অল্পই। পথের শেষে আর একটি ঢাকনি। সুড়ঙ্গের মধ্যে গরম হাওয়া বওয়ানো হচ্ছে তবু এখনও দুর্দান্ত শীতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধ শীতকে গ্রাহ্য করেন না। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন— ওরা জানে না বাইরে রোদ উঠেছে। বরফ গলছে। গিরগিটি দেখা দিয়েছে। ওরা জানে না বরফের নীচে ঘাস জন্মেছে ...বলতে বলতে তিনি বাইরের দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে এলেন বাইরের সাদা মৃত হৈম পৃথিবীতে।

একবারের বেশি শ্বাস টানতে হল না তাঁকে। পরমুহূর্তেই জমে কাঠ হয়ে পড়ে গেল তার শরীর।

ব্যাপারটা টের পেতে সীমন্তকের দেরি হয়নি। টিভি প্যানেলেই সে দৃশ্যটা দেখেছে। বাইরে যাওয়ার পোশাকটুকু পরে নিতেই যেটুকু সময় নিয়েছে, পরমুহূর্তেই সে বাইরে এসে বৃদ্ধের কাঠের মতো শক্ত শরীরটা বয়ে আনল ভিতরে। শরীরে প্রাণের চিহ্ন নেই।

একটা কাচের বাক্সে বৃদ্ধের শরীরটা শুইয়ে দিল সে। সুইচ টিপল। বৃদ্ধকে বাঁচিয়ে তোলাটা তেমন কঠিন হবে না। এই বাক্সের মধ্যে ক্রমশ এক হিটার শরীরটাকে গরম করে তুলবে, বুক মালিশ করবে, শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখবে। বাকি কাজটুকু করবেন গর্ভনগরের মহান চিকিৎসকবৃন্দ। সীমন্তক অবাক হয়ে দেখল। বৃদ্ধের মৃত মুখে একটু নির্মল আনন্দের হাসিও তার শরীরের মতোই জমে বরফ হয়ে আছে।

সীমন্তক কাচের বাক্সে শোয়ানো বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর আপন মনেই বলল — কেন বুড়োবাবা তোমরা একটু রোদ্দুর দেখে অমন পাগল পারা হয়ে ওঠো?

বৃদ্ধের শরীর আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে, প্রাণের চিহ্ন ফিরে আসছে। সীমন্তক জানে বুড়ো লোকটি বেঁচে উঠবে। তবে হয়তো এবার সত্যিই বুড়োর মগজ বদলে ফেলবেন ডাক্তাররা। কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বদলাতে হবে।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল— বেঁচে উঠবে বটে বুড়োবাবা, তবে হয়তো আর কোনোদিন রোদ্দুর দেখে আনন্দে হেসে উঠবে না।

কিন্তু যতক্ষণ না মগজ বদল হচ্ছে, যতক্ষণ না মৃত্যুর ছায়া সরে যাচ্ছে শরীর থেকে ততক্ষণ বৃদ্ধ এক অমলিন রোদ্দুর, গিরগিটি, অরণ্য ও সবুজের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থেকে হাসতে থাকেন।

আশ্চর্য অলিম্পিক

হাঁদুবাবু বেজায় ক্লান্ত। ক্রমাগত ঢুলুনি আসছে, শরীরটাও ভারি ম্যাজম্যাজ করছে, তা ক্লান্তির আর দোষ কী? এবারে দিল্লির অলিম্পিক গেমসের জন্য নতুন রকমের হুকুম হয়েছিল। আকাশের নক্ষত্র দিয়ে পাঁচটি বলয় সাজাতে হবে। কাজ কি সোজা? হাঁদুবাবু একটু গুঁইগুঁই করেছিলেন, কিন্তু হুকুম নড়েনি। গত আড়াই বছরের চেষ্টায় প্রায় আড়াই হাজার নক্ষত্রকে টানাহ্যাঁচড়ায় কক্ষচ্যুত করে নতুন করে সাজাতে হল, পাঁচটি বলয় আবার ভিন্ন ভিন্ন তো নয়, একটার ভিতর দিয়ে আর একটাকে গলাতে হবে। অনেক হিসেব—নিকেশের ব্যাপার ছিল। অলিম্পিকের আর দেরি নেই বলেই উদবোধন অনুষ্ঠান। তবে হাঁদুবাবুর কাজ শেষ হয়েছে। কাজটা উতরেও গেছে চমৎকার। আকাশের দিকে তাকালে যে—কোনো সময়েই পাঁচ—পাঁচটি বলয় দেখা যাবে। হ্যাঁ, এমনকী দিনমানেও। দিনের বেলা যাতে দেখা যায় তার জন্য বিশেষ ট্রিটমেন্টও করতে হয়েছে। আর নক্ষত্র তো আর ছোটোখাটো জিনিসটি নয়। সূর্যের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো নক্ষত্রও রয়েছে। সুতরাং হাঁদুবাবু কেন হাঁফসে পড়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবে মনটা আজ ভারি ভালো লাগছে। এখন বাড়ি ফিরে স্নান করে চারটি খেয়ে টানা ঘুম দেবেন। কাল অলিম্পিক।

ড্রাইভার উদ্ধব ইন্টারকমে বলে উঠল, স্যার, একটু মুশকিল হয়েছে।

হাঁদুবাবু ঢুলতে ঢুলতে বললেন, মুশকিল আবার কীসের?

শর্টকাট ধরে যাচ্ছি, কিন্তু সামনে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে। যন্ত্রপাতি সব উলটো গাইছে। কী করে হল তা বুঝতে পারছি না। আসবার সময় এখানে এ—রকম কোনো ব্যাপার তো দেখিনি।

উদ্ধবটা একটা হাঁদা হাঁদুবাবু জানেন। ওর মগজটাকে রি—সেট করেছেন অনেকবার। কিন্তু আই—কিউ বাড়েনি। তবে উদ্ধব পুরোনো লোক বলে তাকে বাতিল করেননি হাঁদুবাবু, তাঁর বড়ো মায়া। কিন্তু এটা ভালোই বুঝতে পারছেন, উদ্ধবের মতো রোবটকে দিয়ে তাঁর আর বেশিদিন চলবে না।

বাইরের দিকে চেয়ে হাঁদুবাবু দেখলেন, মহাজগতের যেখানে এখন রয়েছেন তার নাগালের মধ্যে সেই মৃতপ্রায় লাল তারাটি। অর্থাৎ পৃথিবী আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। হাঁদুবাবু তাঁর সামনে প্যানেলের দিকে চেয়ে দেখলেন, চৌম্বক ঝড়ে যন্ত্রপাতি কিছু উলটোপালটা রিডিং দিচ্ছেও।

হাঁদুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, উদ্ধব একটু মাথা খাটাতে শেখো। আকাশের অতগুলো নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে রি—অ্যারেঞ্জড হয়েছে। তার ফলে মহাজগতের ভারসাম্যে বেশ বড়ো রকমের ধাক্কা লেগেছে। ফলে

ম্যাগনেটিক স্টর্ম খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমাকে অনেকদিন বলেছি যন্ত্রের ওপর নির্ভর করবে না, বিপদে পড়লে ইনস্টিংক্ট কাজে লাগাবে।

উদ্ধব খুব বিনীতভাবে বলল, যে আজ্ঞে। তবে আমিও যে যন্ত্রই, ইনস্টিংক্ট কোথায় পাব?

হাঁদুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যন্ত্র হলেও গবেট যন্ত্র। গত দশ বছরে তোমার চেয়ে লায়েক অনেক রোবট তৈরি হয়েছে যাদের ইনস্টিংক্টও তৈরি করে নিয়েছে তারা আর নিজের চেষ্টাতেই। তোমার কোনো চেষ্টাই নেই। এ—যুগে এত ক্যালাস হলে চলে!

উদ্ধব চুপ করে রইল। ইনস্টিংক্ট না থাক, উদ্ধবের আবার অভিমান আছে। হাঁদুবাবু বকাঝকা করলে সে কথা বন্ধ করে দেয়। কাঁদেও নাকি। তবে উদ্ধবের কান্না হাঁদুবাবু কখনো দেখেননি। তাঁর গিন্নি রাধারানী নাকি দেখেছেন। আর সেই জন্যই উদ্ধবকে বকলে রাধারানী খুশি হন না। আর রাধারানীর জন্যই হাঁদুবাবু অন্য কোনো রোবটকে রকেট চালানোর কাজে নিয়োগ করতে পারেন না। উদ্ধবকে দিয়েই কাজ চালাতে হয়।

নেপচুনে একটু না থাকলেই নয়, শচীন হোড় সেখানে একটু খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছে গত বছরটাক যাবৎ। শচীনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। এবার অলিম্পিকে অতীতের ক্রীড়াবিদদের আনানোর একটা চেষ্টা চলছে। কতদূর কী হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। অতীত বলতে পঞ্চাশ—ষাট বছর নয়, এক—দেড় হাজার বছর। আগেকার ক্রীড়াবিদেরা যাতে আসতে পারেন, সেটাই শচীন হোড়ের গবেষণার বিষয়। টাইম—মেশিনে অতীত বা ভবিষ্যতে যাতায়াত কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হল অতীত থেকে সেই যুগের মানুষজনকে ধরে আনা নিয়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় সময়ের বেড়া টপকাতে গিয়ে অনেকেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শচীনকে বলা হয়েছে এমন ব্যবস্থা করতে যাতে কারও কোনো অসুবিধে না হয়। শচীন খাটছেও খুব।

নেপচুন বেজায় ঠান্ডা জায়গা। তবে হাঁদুবাবুকে নামতে হবে না। শচীন থাকে মাটির তলায়, অনেক গভীরে, চাপ—তাপ—নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে। যেখানে কৃত্রিম আবহমণ্ডল আছে। তা ছাড়া নেপচুনের উপরিভাগকে তপ্ত ও স্বাভাবিক করে তোলারও চেষ্টা চলছে। হয়ে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে।

হাঁদুবাবুর বকুনি খেয়ে উদ্ধব রকেটটা ভালোই চালাল। চৌম্বক ক্ষেত্রটা পার হয়ে সাঁ—সাঁ করে সৌরমণ্ডলে ঢুকে পড়ল রকেট।

হাঁদুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বেঁধে! বেঁধে! নেপচুনে যে নামতে হবে সে খেয়াল আছে? কবে যে তোমার অন্যমনস্কতা যাবে!

রকেট নেপচুনে নামল এবং সোজা পাতালে গিয়ে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শচীনের ঘরে ঢুকে হাঁদুবাবু একটু থতমত খেলেন। অনেকগুলো লোক বসে আছে। তাদের অনেকের মুখ বেশ চেনা—চেনা ঠেকছে। হাঁদুবাবুকে দেখে শচীন ভারি খুশি হয়ে বলে উঠলেন, আরে এসো এসো হাঁদু! এই যে দেখ, এঁরা সব এসে গেছেন।

এঁরা কারা?

আরে এই তো জেসি ওয়েন্স, একুশ বছর বয়সে পাকড়াই এঁকে। আর ইনি এমিল জেটোপেক, পঁচিশের ছোকরা। এই যে দেখছ জনি ওয়েসমুলার, বাইশ। ইনি হলেন কার্ল লুইস, বাইশ। এই ইনি বেন জনসন, তেইশ। ওই ডালে টমসন— চব্বিশ। এই যে ইনি মার্ক স্পিজ, তেইশ। কুড়ি বছরের ম্যারি ডেয়ারকে তো চেনোই। এই কোণে বুবকা, মোজেস। আর ওই যে কোমানিচি, উইলসা রুডলফ, ওলগা করবুট...

হাঁদুবাবু বুঝলেন, শচীন সফল হয়েছে। খুব খুশি হলেন তিনি।

শচীনবাবু চোখের ইশারায় তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটু সমস্যায় পড়েছি ভাই। এই সব ক্রীড়াবিদদের আনা হয়েছে দর্শক হিসেবে এবং দ্রষ্টব্য হিসেবেও বটে। কিন্তু এঁরা বলছেন এঁরাও অংশ নেবেন। কী করি বলো তো...

হাঁদুবাবু অবাক হয়ে বললেন, তা কী করে হয়? এখনকার অ্যাথলিটরা তো আর...

শচীনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, সেইটেই তো কথা...

খুব জোরাজুরি করছেন কি ওঁরা?

সাংঘাতিক। কোনো নিষেধই শুনতে রাজি নয়।

অলিম্পিক কমিটিকে জানিয়ে দাও। তারা যা ভালো বুঝবে করবে।

জানিয়েছি। তারা সব মিটিংয়ে বসেছে। কিন্তু কমিটি যদি প্রস্তাব নাকচ করে দেয় তা হলে এঁরা বোধহয় জোট বেঁধে আমাকে পেটাবে।

হাঁদুবাবু সচকিত হয়ে বললেন, ও বাবা! খেলোয়াড়রা বড্ড সাংঘাতিক লোক হয়। মারপিটের মধ্যে আমি নেই ভাই। শরীরগতিকও ভালো নয়, ধকল বড়ো কম যায়নি। আমি সরে পড়লুম।

বন্ধু হিসেবে তুমি অতি যাচ্ছেতাই।

না ভাই, আমি শুনেছি খেলোয়াড়রা মারলে নাকি খুব লাগে।

এই বলে হাঁদুবাবু তাড়াতাড়ি এসে রকেটে উঠে দরজা এঁটে দিলেন। একটু বাদেই টের পেলেন, উদ্ধব হাঁদারাম ফাঁক পেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক যাদের কম ক্রিয়াশীল তাদেরই ঘুম বেশি হয়। না, উদ্ধবকে দিয়ে আর চলছে না।

উদ্ধবকে ডেকে তুলে রকেট ছাড়তে বললেন হাঁদুবাবু। মাথায় একটু উদবেগ লেগে রইল। অলিম্পিকে একটা গোল না বাঁধে। অতীতের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে আসাটা কি ভুল হল?

বাড়িতে ফিরে হাঁদুবাবু তাঁর স্বয়ংক্রিয় স্নানঘরে ঢুকে গেলেন। যান্ত্রিক সব হাত এসে গায়ে তেল মাখাল, স্নান করাল, দাড়ি কামিয়ে দিল, মাথা টিপে দিল, গা মোছাল, কাপড় পরিয়ে দিল। রাধারানী বাড়ি ছিলেন না, বাজার করতে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন সকালে। দুপুরেই অবশ্য ফিরে আসবেন।

স্নান করে উঠে হাঁদুবাবু হাঁক মারলেন, কই রে টেঁপি, খেতে দে।

যাই বাবা। বলে ফুটফুটে এক যন্ত্রমানবী দৌড়ে এল। চটপট হট বক্স খুলে খাবার সাজিয়ে দিল টেবিলে। শুধু তা—ই নয়, সাধাসাধি করে এটা—ওটা—সেটা যাচাই করে খাওয়াল।

হাঁদুবাবু একটু বিশ্রাম নিয়ে দিল্লির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন। শুনলেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর নক্ষত্র সাঁজানো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নোবেল কমিটিতে তাঁর নাম পেশ হল বলে।

ঘুম ভাঙল রাধারানীর চেঁচামেচিতে। বিকেলে ঘর ঠিকমতো ঝাঁটপাট হয়নি, জলছড়া দেওয়া হয়নি, ঠাকুরের কাছে সাঝের বাতি দেওয়া হয়নি, ধূপ জ্বালানো হয়নি। টেপি নাকি টিভি খুলে একটা সিনেমা দেখছিল।

টেঁপিটাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন হাঁদুবাবু। তাড়াতাড়ি উঠে রাধারানীকে বললেন, আহা থাক থাক, বোকো না। ছেলেমানুষ তো।

তোমার আশকারা পেয়েই তো দিন—দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দেখ তো গিয়ে আর—পাঁচটা বাড়িতে। যন্ত্রমানবীরা কেমন সুন্দর সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলেছে!

রাত্রিবেলা খেয়েদেয়ে গিন্নির সঙ্গে একটু সাংসারিক কথা বলে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলেন হাঁদুবাবু। সকালেই দিল্লি যেতে হবে। অলিম্পিক বলে কথা!

অলিম্পিকের মার্চ পাস্ট ইত্যাদিতে প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। অতীতের অ্যাথলিটদেরও মার্চ পাস্টে অংশ নিতে দেওয়া হল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল দ্বিতীয় দিনেই। আমেরিকার প্রতিযোগী দ্বিতীয়জন মাত্র চার সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়ে বাজি জিততেই যেন জনসন আর কার্ল লুইস চেঁচিয়ে বলতে লাগল, এটা কী হচ্ছে। এক সেকেন্ডে একশো ভাগের এক ভাগ সময় কমাতে আমাদের কালঘাম ছুটে যেত। চার সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়ানো যে অসম্ভব।

গোলমাল বাধল আরও পরে। রুশ জাম্পার মেয়াগই ভলাদিমিদি হাই জাম্পে চোদ্দো ফুট ডিঙিয়ে ফেলল। ভালেরি ব্রুমেল আর সোবার্স ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এটা কী করে হচ্ছে!

বুবকার জন্য আরও বিস্ময় বাকি ছিল। পোল ভল্টে মার্কিন ভল্টার চল্লিশ ফুট পার হয়ে গেল। জিমনাস্টিকস সাঁতার ওয়েটলিফটিং ইত্যাদিতে ইদানীংকালের ক্রীড়াবিদেরা এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে অতীতের ক্রীড়াবিদেরা মুখ লুকোনোর জায়গা খুঁজতে লাগলেন।

অতীতের ক্রীড়াবিদরা এসব কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই দমে গেলেন। ইদানীংকালের অ্যাথলিটদের কাছে তাঁরা পাত্তাও পেলেন না। বিজয়ী অ্যাথলিটরা যেন পাত্তাই দিল না তাঁদের।

তবে যা—ই হোক, ভালোয় ভালোয় অলিম্পিক শেষ হয়ে গেল। তেমন কোনো গণ্ডগোল হল না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট অতীতের অ্যাথলিটদের খুব আদর করে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। গোমড়া মুখে ক্রীড়াবিদেরা এলেন ডিনারে। তাঁদের ধারণা, অপমান করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের অতীত থেকে টেনে আনা হয়েছে।

বিশাল ভাসমান কাচের টেবিলে এলাহি খাওয়া—দাওয়ার বন্দোবস্ত। টেবিল বা চেয়ারের পায়া বলে কিছু নেই। সবই ভেসে আছে। চেয়ারগুলো আবার অদ্ভুত। বসলে টেরই পাওয়া যায় না যে কীসের ওপরে লোকে বসে আছে। ভারি সুখানুভূতি হয়। চারদিকে ভারি চমৎকার রোশনাই, চোখে লাগে না, কিন্তু সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। আর খাওয়ার ঘরে যে মৃদু বাজনা শোনা যাচ্ছে, তাও সম্মোহনকারক বিটোফেন। কিন্তু পিয়ানো—টিয়ানো বা বেহালা—টেহালা নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কোনো বাদ্যযন্ত্র। তার মিঠে আওয়াজে কান ভরে যায়।

আয়োজন দেখে ক্রীড়াবিদেরা হতচকিত, মুগ্ধ। আই ও সি—র প্রেসিডেন্ট সবাইকে স্বাগত জানিয়ে অতীতের ক্রীড়াবিদদের নৈপুণ্যের সবিশেষ প্রশংসা করে তাঁদের হাতে এ—যুগের নানা মূল্যবান উপহার তুলে দিলেন। অবশ্য কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উপহারের মধ্যে ছিল না। কারণ এই সব উপহার অ্যাথলিটদের সঙ্গে অতীতে ফিরে যাবে। এই সব যন্ত্রপাতি অতীতে গেলে বিরাট গণ্ডগোল বেধে যেতে পারে। তাঁদের এমন সব জিনিস দেওয়া হল যা অতীতে গেলেও ক্ষতি নেই।

যা—ই হোক, অতীতের অ্যাথলিটদের পক্ষ থেকে নেতা নির্বাচন করা হল জেসি ওয়েন্সকে। ওয়েন্স এই আপ্যায়ন আর আতিথেয়তার জবাব দিতে উঠে বললেন, মানুষ এ—যুগে ক্রীড়াদক্ষতার এমন জায়গায় পৌঁছেছে যা কোনোদিন সম্ভব বলে আমরা ভাবিনি। কোন মন্ত্রে মানুষ এমন দক্ষতা অর্জন করল তা একটু জানতে পারলে আমি অতীতে ফিরে গিয়ে সেই কৌশলই অনুশীলন করতাম। আমাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের যে—প্রশংসা এখানে শুনলাম, সেটাকে বিদ্রূপ বলেই ধরে নিচ্ছি।

এ—কথায় এ—যুগের মানুষেরা কেন যেন চুপ করে রইল।

হাঁদুবাবু শচীনের কানে কানে বললেন, এঃ, তুমি বলে দাওনি জেসিদাদাকে! দেখ তো কী সব বলে যাচ্ছেন উনি!

শচীন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, সুযোগও হয়নি, আর সাহসও পাইনি।

হাঁদুবাবু বললেন, মোটেই তা নয়। তুমি আসলে ওঁদের একটু কড়কেও দিতে চেয়েছিলে।

শচীনবাবু ফিচিক করে হেসে বললেন, চুপ চুপ; শুনতে পাবে। আসলে কী জানো, লোকগুলো এমন তেরিয়া হয়ে উঠেছিল, ভাবলুম দিই নামিয়ে, যা হয় হবে।

কাজটা ভালো করোনি। তোমার কপালে দুঃখ আছে।

জেসি ওয়েন্সের বক্তৃতার শেষে ক্ষীণ একটু হাততালি পড়ল। অপ্রস্তুতভাবে আই ও সি—র প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ একটু হেসে হাতটাত কচলে বললেন, শ্রদ্ধেয় জেসি ওয়েন্স একটু ভুল করেছেন। হয়তো ভুলটা আমাদেরই। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, আজকাল অলিম্পিকে কোনো মানুষই অংশ নেয় না।

ঘরে সূচীভেদ্য নীরবতা।

কার্ল লুইস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে ওরা কারা?

প্রেসিডেন্ট রুমালে মুখ মুছে একটু জল খেয়ে গলা পরিষ্কার করে বললেন, আসলে বহুকাল আগে থেকেই মানুষের খেলাধুলোর চর্চায় ভাটা পড়ে যায়। তার কারণ হল, আড়াই হাজার সাল নাগাদ ক্রীড়াজগতে মানুষ যতটা উন্নতি করা সম্ভব করে ফেলল। কিন্তু তার পর থেকে আর নতুন কোনো রেকর্ড করা সম্ভব হচ্ছিল না। কত রকম চেষ্টাতেও দৌড়ের সময় কমানো বা লাফের দূরত্ব বাড়ানো গেল না। ফলে ক্রীড়াচর্চায় সেই যে ভাটা পড়ল, সে ভাটা এখনও চলেছে। মানুষ এখনও একটু—আধটু খেলে বটে, তবে নিতান্তই শরীরটা ঠিক রাখার জন্য। তার বেশি কিছু নয়। খেলা নিয়ে মাথা ঘামানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কী বলব আপনাদের, একটা সময় এল যখন ফুটবল খেলাতেও কেবলই ড্র হয়। আর টস করে জয়—পরাজয় নির্ধারণ করতে হয়। টেনিসে কেবলই ডিউস হতে থাকে। বোঝা গেল এই অচলাবস্থার নিরসন সহজে হবে না। সংগত কারণেই মানুষ খেলাধুলো ছেড়ে দিল। কিন্তু তাই বলে তো আর অলিম্পিক তুলে দেওয়া যায় না। মানুষের বদলে এখন বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগী হিসেবে পাঠায় যন্ত্রমানবদের। এবার অলিম্পিকেও আপনারা তাদেরই দেখেছেন। আপনাদের তাদের সঙ্গে নামতে দেওয়ার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। শচীনবাবু আপনাদের ব্যাপারটা খুলে বলে দিলে এই গণ্ডগোলটা হত না। যা—ই হোক, ওই যন্ত্রমানবদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে হেরে গেলেও আপনারা কিন্তু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এ—কথা শুনে অতীতের অ্যাথলিটরা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর সবাই হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

উলট-পুরাণ
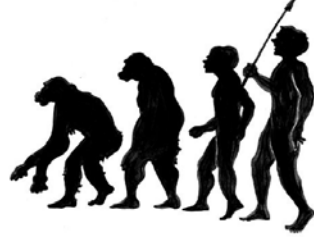
বাইরের জরুরি কাজ সেরে ফিরতে এবার একটু দেরিই হল বজ্রবাহুর। কাজটাও ছিল ঝামেলার আর দূরত্বটাও বড়ো কম নয়। তবে দেরি হলেও বাড়ির খবর নিয়মিতই পেয়েছেন। তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী এবং খোকা—খুকিরা ভালোই আছে। আড়াই হাজার বছরে আর এমন কী—ই বা বিশেষ পরিবর্তন হবে।

এই আড়াই হাজার বছর শুনতে যতটা, কার্যত তো ততটা নয়। কারণ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে যেতে যেতে আপেক্ষিক নিয়মে যতটা সময় লাগে, তার ঢের বেশি সময় পৃথিবীতে অতিক্রান্ত হয়। আর কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময় তো টেরও পাওয়া যায় না। বজ্রবাহু যে—নক্ষত্রের মণ্ডলে গিয়েছিলেন সে—নক্ষত্রটি সূর্যের চেয়ে দশগুণ বড়ো। আর তার মণ্ডলে রয়েছে অন্তত আড়াইশো সবুজ সজীব গ্রহ, যার প্রত্যেকটিই মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য। তাদের মধ্যে অন্তত কুড়িটিতে অতি সুসভ্য সব জীবের বাস, যারা অনেকটাই মানুষের মতো। তবে বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি করেনি। এইসব গ্রহ—গ্রহান্তরে ঘুরে ঘুরে বিস্তর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে বজ্রবাহু ও তাঁর দলকে। তাঁদের সফর খুবই সফল হয়েছে, পৃথিবীতে তাঁদের খুবই প্রশংসা হচ্ছে। আলোর চেয়েও বহু—বহুগুণ গতিবেগসম্পন্ন কণিকা তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের নিত্যই কথাবার্তা হত। নতুন এই মণ্ডলের সুসভ্য প্রাণীদের কয়েকজনকে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হত। কিন্তু জীবগুলি খুবই আদুরে। তাদের গ্রহগুলিতে এত খাদ্যশস্য, এত ভালো আবহাওয়া এবং এমনই আরামে তারা আছে যে, মাথা ঘামিয়ে বা খেটেখুটে কিছুই করতে হয় না। ফলে তারা বিজ্ঞান—প্রযুক্তি এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। খায়দায়, দিনরাত ফুর্তি করে। তবে মোটরগাড়ি বা এরোপ্লেনের মতো সেকেলে যানবাহন তাদের আছে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বিজলি বাতি আছে। তার চেয়ে বেশিদূর আর এগোয়নি। এগোতে বিশেষ আগ্রহও নেই। বজ্রবাহু প্রায় এক হাজার বছর ধরে এইসব গ্রহ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বুদ্ধিমান জীবকে উন্নত প্রযুক্তিতে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তারা একটু শেখে, তারপর আর গা করে না। এমনকী যে—বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর মানুষ অমরত্ব অর্জন করেছে তাও তারা একরকম প্রত্যাখ্যানই করেছে। তাদের ভাবখানা হল, প্রকৃতির নিয়মে যা হওয়ার হবে, আমাদের বেশি আকাঙ্ক্ষা নেই। ফলে তারা কেউই বজ্রবাহুর সঙ্গে পৃথিবীতে আসতে চায়নি। এই একটা ব্যর্থতা ছাড়া বজ্রবাহুর সফর খুবই সফল। তিনি নানা অদ্ভুত উদ্ভিদ ও মাটি, ধাতু ও শিলাখণ্ড এনেছেন। এনেছেন ওইসব গ্রহের নানা শিল্পের নমুনা। আরও অনেক কিছু।

পৃথিবীর মহাজাগতিক অবতরণ—কেন্দ্রে তাঁদের খুব জাঁকালো রকমের স্বাগত জানানো হয়েছে। বিশ্বরাষ্ট্রপতি স্বয়ং এসে তাঁদের অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছেন। বজ্রবাহু ও তাঁর দলের পাঁচ—শো জন সদস্য পৃথিবীতে নেমে দেখলেন সবই সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার মতোই আছে। তেমন সাংঘাতিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিছু নতুন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর বিজ্ঞান এমন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে যে, নতুন কিছু আবিষ্কারও আর তেমন ঘটে না। মানুষ অমরত্ব অর্জন করায় আর নতুন মানুষ

জন্মায় না। তবে কিছু মানুষ যখন অন্য গ্রহে স্থায়ীভাবে বাস করতে চলে যায় তখন কিছু মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে বজ্রবাহুর বাবা, মা, স্ত্রী ও ছেলে—মেয়েরাও ছিল। সকলেই একই রকম আছে। কারও বয়সই তিন—চার হাজারের কম নয়। শুধু ছোটোরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই। বজ্রবাহুকে দেখে তাঁরা সকেলেই যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাড়িতে ফিরে বজ্রবাহু বহুদিন পরে পোস্তচচ্চড়ি আর চালতার অম্বল দিয়ে ভাত খেলেন। যেসব গ্রহে গিয়েছিলেন সেখানকার খাদ্যদ্রব্য অন্যরকম। পুরোনো অভ্যস্ত খাবার খেয়ে বহুকাল পর ভারি খুশি হলেন বজ্রবাহু। সকলের সঙ্গে বসে গল্প—টল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বিভিন্ন মিটিং ও সংবর্ধনা সভায় যেতে হল।

এরকমই একটা মিটিঙে তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্যতম পুণ্ডরীক বজ্রবাহুকে কানে কানে বলল, 'ওহে বজ্রবাহু, মানুষের হাসিখুশির ভাবটা বেশ খানিকটা কমে গেছে, লক্ষ করেছ?'

বজ্রবাহুর হঠাৎ মনে হল, পুণ্ডরীক মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যিই, ওপর ওপর সবাই একটা খুশিয়াল ভাব দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। নিজের স্ত্রী, ছেলে—মেয়ের মধ্যেও যেন এটাই আজ লক্ষ করেছেন তিনি, কিন্তু ধরতে পারেননি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো পুণ্ডরীক! আড়াই হাজার বছরে এমন কী হল?'

পুণ্ডরীক মাথা চুলকে বলে, 'কিছুই তো হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীর কোনো পরিবর্তন দেখছি না। বিবর্তনও বহুকাল হল থেমে গেছে। মানুষের কোনো দুঃখ বা অভাব নেই। সুতরাং কী ঘটতে পারে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তবে একটা জিনিস লক্ষ করছি, পৃথিবীতে আগের তুলনায় গাছপালা কিছু বেড়ে গেছে।'

বজ্রবাহু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'গাছপালা বেড়ে গেছে? কিন্তু সেরকম তো কথা নয়! আবহমণ্ডলের জন্যে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই গাছপালা পৃথিবীতে থাকার কথা।'

পুণ্ডরীক মাথা সামান্য নেড়ে বলে, 'উদ্ভিদ—উপদেষ্টার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি এ—ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাইছেন না। শুধু বললেন, গাছ বাড়লে শেষ অবধি মানুষের উপকারই হবে। কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকল। কিন্তু উনি আর ভাঙলেন না।'

বজ্রবাহু নিজে আবহাওয়া ও উদ্ভিদের একজন বিশেষজ্ঞ। কথাটা তাঁরও হেঁয়ালির মতো ঠেকল। মানুষজন, জন্তুজানোয়ার এবং আবহাওয়ার একটা অনুপাত হিসেব করেই গাছপালার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গাছ বাড়লে মানুষের কী উপকার হবে তা বজ্রবাহুর মাথায় এল না।

পৃথিবীতে আড়াই হাজার বছরের মেলা বকেয়া কাজ জমে আছে। ফলে বজ্রবাহু ও তাঁর দলবল এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তাঁরা বকেয়া কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে আজকাল কাজকর্ম বেশিরভাগই যন্ত্রের মাধ্যমে সমাধা হয়ে যায় বলে তেমন গা ঘামাতে হয় না। বজ্রবাহুদের খাটতে হচ্ছিল অন্যান্য গ্রহ থেকে আনা তথ্যাবলি রেকর্ড করে রাখতে এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে।

বজ্রবাহুর বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ির সবাই তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছেন। বজ্রবাহু সকলের মুখই খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। বাস্তবিকই, কারও মুখেই খুব একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাব নেই। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবী থেকে রোগভোগ মৃত্যু বিদায় নিয়েছে। অভাব, কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই। তাহলে চাপা বিষণ্নতা দেখা যাচ্ছে কেন?

খাওয়ার টেবিলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মস্ত টেবিল ঘিরে সবাই খেতে বসেছেন। বজ্রবাহুর দু—ধারে তাঁর স্ত্রী এবং বোন। হঠাৎ পিঠে একটু সুড়সুড়ি লাগায় বজ্রবাহু চমকে উঠে পিছনে হাত বাড়িয়ে খপ করে একটা সাপকে ধরে ফেললেন। তারপর সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাপ! সাপ! বাবা রে!'

তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বললেন, 'সাপ নয়। ছেড়ে দাও।'

'সাপ নয় মানে!' বলে লাফিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু। টেবিলে সবাই নিঃশব্দে নতমুখে বসে আছেন। বজ্রবাহু সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি যা ধরেছেন তা সত্যিই সাপ নয়।

'কী এটা!' বলে ফের বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু।

তাঁর নতমুখী স্ত্রী বললেন, 'ছেড়ে দাও। ওটা আমার লেজ।'

'লেজ!' বলে হাঁ করে রইলেন বজ্রবাহু। তাঁর শিথিল হাত থেকে সর্পিল জিনিসটা খসে পড়ল।

বজ্রবাহুর বাবা মৈনাক গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তুমি পৃথিবীতে ছিলে না, এর মধ্যেই এই একটা অঘটন ঘটতে শুরু করেছে। দু—হাজার বছর আগে হঠাৎ ক্রমে ক্রমে মানুষের লেজ হতে শুরু করেছে। প্রথমে একটা গ্যাঁজের মতো বেরোয়। তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। লেজ খসানোর অনেক প্রক্রিয়া করেও লাভ হয়নি। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই এক হাত, দেড় হাত দু—হাত লম্বা লেজ হয়েছে। কাপড়চোপড়ে ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সত্যটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।'

বজ্রবাহু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। 'লেজ! লেজ হচ্ছে কেন? একটা কারণ তো থাকবে!'

মৈনাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'লেজ গজানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবও একটু একটু পালটাচ্ছে। ঘরে থাকার চেয়ে আজকাল কেন যেন আমাদের গাছের ডালে উঠে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। তুমি জান না, আমরা সবাই এখন খুব ভালো গাছ বাইতে পারি, এ—ডাল থেকে ও—ডাল লাফিয়ে লাফিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই। আমাদের স্বভাবে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে।'

বজ্রবাহু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কই, আমার তো হয়নি!'

মৈনাক বললেন, 'তুমি এই বিবর্তনের সময়টায় পৃথিবীতে ছিলে না, তাই বেঁচে গেছ।'

বজ্রবাহু খাওয়া ফেলে উঠে রাষ্ট্রপতিকে ফোন করলেন, 'আপনার কি লেজ আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি?'

'আছে বজ্রবাহু।'

উপরাষ্ট্রপতি বললেন, 'আছে হে আছে।'

অন্তত পঞ্চাশ জনকে ফোন করে নিঃসংশয় হলেন বজ্রবাহু। মাথা গরম হয়ে গেল। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, 'এর মানে কী? কারণই—বা কী?'

মৈনাক ছেলের অস্থিরতা দেখে তাঁর কাছে এসে নরম গলায় সান্ত্বনা দিলেন, 'অত অস্থির হোয়ো না। মানুষের কোনো কাজ নেই, সব কাজ যন্ত্র করে দিচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করছে না, যন্ত্রই তার হয়ে ভাবছে। মানুষের মৃত্যুও নেই, হাজার হাজার বছর সে খামোখা বেঁচে থাকছে। তাই বিবর্তন থেমে গেছে। কিন্তু প্রকৃতি তো থেমে নেই। সে তাই মানুষের বিবর্তনের প্রগতি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে উলটো বিবর্তনের পাল্লায় ফেলে দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে।'

বজ্রবাহু রেগে যেতে গিয়েও রাগলেন না। রেগে লাভ নেই। কারণ, কথাটা মিথ্যে নয়।

এতক্ষণ যেটা লক্ষ করেননি, তা পরদিন সকালেই লক্ষ করলেন বজ্রবাহু। গাছে গাছে প্রচুর মানুষ দোল খাচ্ছে, লাফালাফি করছে, আনন্দে চ্যাঁচাচ্ছেও কেউ কেউ। লক্ষ করলেন, অনেকেই আবার নিজেদের লেজ নির্লজ্জভাবেই প্রদর্শনও করছে। এও লক্ষ করলেন, মানুষের গায়ে বেশ ঘন ও বড়ো বড়ো লোম গজাচ্ছে আজকাল।

উত্তেজিত বজ্রবাহু গিয়ে পুণ্ডরীককে ধরলেন, 'এসব কী হচ্ছে বলবে?'

পুণ্ডরীক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আবার গোড়া থেকে আমাদের সব শুরু করতে হবে মনে হচ্ছে। মানুষ বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেলে ফের উলটো পথে বিবর্তন যদি আবর্তিত হয় তাহলে দূর ভবিষ্যতে আবার মানুষ দেখা দেবে পৃথিবীতে। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই বজ্রবাহু।'

'আর আমাদের কী হবে?'

'আমরা অন্য গ্রহে পালিয়ে যেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে লাভ কী? আমাদের আপনজনেরা তো বানর হয়ে যাবেই।'

'তা হলে?'

আর—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুণ্ডরীক বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদেরও...'

বাস্তবিক, মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যেই বজ্রবাহু, মৈনাক এবং তাঁদের দলবলের লেজ গজাতে লাগল। আর অন্যদিকে, পৃথিবীতে গাছে গাছে বানরের ভিড়। হুপহাপ, দুপদাপ শব্দ। গাছাপালায় সভ্যতা ঢেকে যেতে লাগল।

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনীদেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল—কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যেসব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মা!তসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু—হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড়ো কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পালটাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর—সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমতো বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র—কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কী ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে 'নাড়ু খাব, নাড়ু খাব' বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড়ো ছেলের ছোটো ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন ছেলের কোন ছেলের কোন ছেলে, বা কোন মেয়ের কোন মেয়ের কোন মেয়ের মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন ছেলের কোন মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন মেয়ে, সেসব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কম্পিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ—মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন। কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোনটা খেতে ভালোবাসে, কোনটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভীতু, কে—ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কম্পিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, 'মা, নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?'

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!'

'ভুল হয়ে গেছে মা।'

'অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি দে তো একটা।'

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, 'খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।'

'আচ্ছা মা।' বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটু কাসির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক—ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, 'আবার এ—ঘরে ছোঁকছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?'

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার—পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, 'ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার—মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।'

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।'

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু—খানা দু—গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, 'তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?'

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলে, 'ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?'

'যাই মা।' বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, 'বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?'

'খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।'

'তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।'

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।'

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনো?'

'কেন কী হয়েছে?'

'সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত—বড়ো হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমায় সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।'

'তাও যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?'

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এবার অটো বড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়।'

'দিচ্ছি মা।'

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাঙ্ঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাচের ঢাকনাওলা বড়ি—বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি—বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি—বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল—পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি—বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু—দিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি—বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি—বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি—বেলুনে একটা পাহারাদার কম্পিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি—বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে—বাঁয়ে বা ওপর—নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবননিলীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাবল বা বুদবুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদবুদবন্দি হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালোবাসেন বলে বাসবননিলনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা পয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোটো ছোটো ট্যাবলেট যা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনো ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে—হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছোলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দনমতো আলু—কুমড়ো—পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত ঝাঁকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন—পটল—ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনো বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোটো ছোটো ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনো অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি—বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারাজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য—পানীয়ের একখানা ছোটো আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদবুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড়ো বড়ো উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনো পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে—নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড—স্কিও করছে কেউ কেউ। হাওয়াই—বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক—ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি—বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, 'কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?'

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচায্যের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম—জাম—কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের কোনো অসুবিধেই হত না। এই বড়ি—বেলুনে রোদে—দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড়ো কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।'

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।'

'কেন রে, কী হল?'

'আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিয়োতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।'

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলিস কী! এতো সব্বোনেশে কাণ্ড।'

রেমো একটু হেসে বলল, 'তোমরা পুরোনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ—যুগের কোনো খবরই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার—দাবারে বিষটিষও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।'

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃদপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।'

রেমো হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কবজায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায় তলায় সকলের সাঁট। এমনকী দুষ্টুমির তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনেনি?'

'না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।'

'যাই ঠাকুমা, মা বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।'

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অক্সিজেন—রুমাল মাঝে মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই—জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট—কাজের— লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট—গয়লা, রোবট—ধোপা, রোবট—নাপিত, রোবট—ফেরিঅলারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট—ডাক্তার, রোবট—নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজি গলায় বলছিলেন, 'ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল একদম গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?'

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকসে করা। রোবটরা কখনো বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনো নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, 'শোনো, এখন চাকরবাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পালটে গেছে।'

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?'

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, 'আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?'

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, 'শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আসকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যান্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।'

বাসবনলিনী ভীতু গলায় বললেন, 'সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?'

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, 'অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।'

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, 'কী ওষুধ?'

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, 'আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি. এতদিনে ফল ফলেছে।'

'বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।'

'দেখাব, কিন্তু পাঁচ—কান করতে পারবে না, তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।'

'না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।'

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, 'বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না তার চেয়েও বড়ো কথা, ভয়—টয় পেতে পারো।'

'জিনিসটা কী?'

'দেখলেই বুঝবে।'

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভূত শব্দ উচ্চচারণ করতে লাগলেন, 'ওঁং ফট, ওঁং ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া....' ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?'

আশুবাবু হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, 'এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু লোকটা আসলে কে?'

এ—কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো—করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, 'এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখাসাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ—বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।'

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, 'আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও টিট করবে ওরাই।'

কেলে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনো চিন্তা করবেন না।'

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবারা!'